প্রকৃত শিষ্যত্ব

উইলিঅম ম্যাকডোনাল্ড

অনুবাদ

শচীন দাশ

GOSPEL FOR ASIA
PUBLICATIONS
Tiruvalla, Kerala, India

PROKRITO SHISHYATHO
Bengali
Translation of the book, 'True Discipleship' by
William MacDonald
ISBN 81 - 7377 - 084 - 0
Copyright 2000 Author
First Impression 2000
Printed in India
Price Rs. 37.00

প্রস্তাবনা

এই পুস্তকে নতুন নিয়মে বর্ণিত শিষ্যত্ব বিষয়ে কতকগুলি নীতির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। শাস্ত্রবাক্যের এই নীতিগুলি আমরা অনেকেই লক্ষ করেছি, কিন্তু আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, এই নীতিগুলি অত্যন্ত চরম এবং আজকের জটিল যুগে অবাস্তব। তাই আমাদের আত্মিক বাতাবরণ শীতল হয়ে যেতে দেখেও তাকে আমরা অসহায়ভাবে মেনে নিয়েছি।

এর পর আমরা একদল তরুণ বিশ্বাসীকে দেখলাম। তাদের জীবনের মাধ্যমে তারা লোকের কাছে প্রমাণ করেছে যে, পরিত্রাতার শিষ্যত্ব সম্পর্কিত শর্তগুলি শুধু যে অত্যন্ত বাস্তব তা-ই নয়, বরং সুসমাচার প্রচারের জগতে একমাত্র এই শর্তগুলিই ফলদান করবে।

এখানে যে-সত্যগুলি উপস্থাপিত হয়েছে, তার অধিকাংশই নিজেদের জীবনে জীবন্ত দৃষ্টান্ত রূপে তুলে ধরার জন্য এই তরুণদলের কাছে আমি ঋণী।

এই সত্যগুলি এখনো পর্যন্ত যদি আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বহির্ভূত হয়, সেগুলিকে আমাদের হৃদয়ের আকুলতা রূপে উপস্থাপন করলাম।

—উইলিঅম ম্যাকডোনাল্ড

ভূমিকা

কোনো মানুষ যখন নবজন্ম লাভ করে, তখনই প্রকৃত শিষ্যত্বের পথে তার যাত্রা শুরু হয়। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি সংঘটিত হলেই তবে এই যাত্রা আরম্ভ হয় ঃ

(১) কোনো মানুষ যখন উপলব্ধি করে, সে পাপী, নিরুদ্দিষ্ট, অন্ধ এবং ঈশ্বরের সামনে উলঙ্গ।

(২) যখন সে স্বীকার করে যে, তার চারিত্রিক গুণ বা সৎকর্মের দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে পারে না।

(৩) যখন সে বিশ্বাস করে, প্রভু যীশুখ্রীস্ট তার পরিবর্তরূপে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন।

(৪) যখন সে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং যীশুখ্রীস্টকে তার প্রভু এবং পরিত্রাতা রূপে স্বীকার করে।

এইভাবেই মানুষ খ্রীস্টবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। শুরুতে এ বিষয়ে গুরুত্ব দান করা খুবই জরুরি। অনেক লোক মনে করে খ্রীস্টীয় জীবনযাপন করেই আপনি খ্রীস্টবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। *একেবারেই* তা নয়। খ্রীস্টীয় জীবনযাপন করার আগে আপনাকে অবশ্যই খ্রীস্টবিশ্বাসী হতে হবে।

পরবর্তী পাঠ্যগুলিতে যে শিষ্যত্ব-জীবনের রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে, তা অতিপ্রাকৃত জীবন। আমরা নিজেদের শক্তিতে সেই জীবন যাপন করতে পারি না। শুধু যখন আমরা নবজন্ম লাভ করি, কেবল তখনই যীশুর শিক্ষানুযায়ী জীবনযাপন করার শক্তি লাভ করি।

অন্য কিছু পাঠ করার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, "আমি কি নবজন্ম লাভ করেছি? প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করে আমি কি ঈশ্বরের সন্তানে পরিণত হয়েছি?"

তা না হলে, এখনই তাঁকে অপনার প্রভু এবং মুক্তিদাতা রূপে গ্রহণ করুন। এর পর সিদ্ধান্ত নিন, যত মূল্যই দিতে হোক, তাঁর সমস্ত নির্দেশ অনুসারে তাঁর প্রতি বাধ্যতায় জীবন অতিবাহিত করুন।

—উইলিঅম ম্যাকডোনাল্ড

শিষ্যত্বের শর্ত

প্রকৃত খ্রীস্টধর্ম প্রভু যীশুর প্রতি সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা।

মুক্তিদাতা এমন নর-নারীর সন্ধান করেন না, যারা তাদের সন্ধ্যার বাড়তি সময়টুকু অথবা তাদের সপ্তাহ-শেষের অবকাশ—বা অবসর গ্রহণের পরবর্তী সময় তাঁকে দেবে। বরং, যারা তাদের জীবনে তাঁকে অগ্রাধিকার দেয়, তিনি তাদেরই খোঁজেন। এইচ. এ. ইভান হপ্‌কিনস বলেছেন, "যারা তাঁর পথে নিরুদ্দেশ্যভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন মানুষদের তিনি খোঁজেন না। তিনি এমন ব্যক্তি-মানব বা মানবীর সন্ধান করেন যারা একান্তভাবে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং যে-আত্মত্যাগের পথে তিনি পূর্বেই চলেছেন, সেই পথে চলতে প্রস্তুত থাকে।"

কালভেরিতে তিনি যে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোনো কিছুই তার যোগ্য উত্তর হতে পারে না। তাঁর এত বিস্ময়কর, এত স্বর্গীয় ভালোবাসা আমাদের আত্মা, জীবন এবং সর্বস্ব দান ব্যতীত আর কোনো কিছুতেই পরিতৃপ্ত হতে পারে না।

প্রভু যীশু তাঁর ভাবী শিষ্যদের কাছে কতকগুলি কঠিন দাবি করেছেন—অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ দাবি, কিন্তু আজকের বিলাসবহুল জীবনে আমরা সেগুলিকে উপেক্ষা করে আসছি। বহু সময়েই খ্রীস্টধর্মকে আমরা নরক থেকে উদ্ধারের এবং স্বর্গলাভের নিশ্চয়তা রূপে দেখে থাকি। এ ছাড়াও, আমরা অনুভব করি, এই জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সবকিছুই ভোগ করার অধিকার আমাদের আছে। আমরা জানি, শিষ্যত্ব সম্পর্কে বাইবেলে অনেক কঠিন কঠিন পদ আছে, কিন্তু প্রকৃত খ্রীস্টধর্ম সম্পর্কিত আমাদের ধারনার সঙ্গে এর সমন্বয় সাধন করতে আমরা অসুবিধা বোধ করি।

আমরা স্বীকার করি যে, নেতারা দেশাত্মবোধের কারণে তাদের জীবন বিসর্জন দেয়। কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক কারণে জীবন বিসর্জন দিলে আমরা বিস্ময় বোধ করি না। কিন্তু সহজগম্য না-হলেও "রক্ত, ঘাম এবং চোখের জল" একজন খ্রীস্টানুসারীর জীবনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত।

প্রভু যীশুর বাক্যগুলি যথেষ্ট স্বচ্ছ। সেই বাণীগুলিকে যদি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করি, তা হলে ভুল বোঝাবুঝির কোনো অবকাশ থাকে না। জগতের পরিত্রাতা শিষ্যত্বের যে-শর্ত আরোপ করেছেন, সেগুলি এখানে আলোচনা করা হল ঃ

১. যীশুখ্রীস্টের জন্য পরম ভালোবাসা

“যদি কেউ আমার কাছে আসে, আর নিজের পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীগণকে, এমন-কী, নিজের প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না-করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না” (লুক ১৪ : ২২)। এর অর্থ নয় যে, আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ বা বদ-ইচ্ছা থাকবে। এর অর্থ, খ্রীস্টের প্রতি আমাদের ভালোবাসা এত মহান হবে যে, তুলনায় অন্য সব ভালোবাসা হবে ঘৃণিত। প্রকৃতপক্ষে, এখানে “নিজের প্রাণকেও.....” এই শব্দসমষ্টি সবচেয়ে কষ্টকর অভিব্যক্তি। শিষ্যত্বের ক্ষেত্রে আত্ম-প্রেমই সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তাঁর জন্য নিজেদের এই জীবন বিসর্জন দিতে ইচ্ছুক হব, তিনি তাঁর মনোমত স্থানে আমাদের পৌঁছে দিতে পারবেন না।

২. আত্ম-অস্বীকার

“কেউ যদি আমার অনুসারী হতে ইচ্ছা করে, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক” (মথি ১৬ : ২৪)। অহং-য়ের অস্বীকার এবং আত্ম-অস্বীকার এক নয়। আত্ম-অস্বীকারের অর্থ, কিছু খাদ্য, আমোদ-প্রমোদ অথবা সম্পত্তি পরিহার করা। কিন্তু অহংকে অস্বীকার করার অর্থ, খ্রীস্টের প্রভুত্বের কাছে নিজেকে এমনভাবে সমর্পণ করা যে, অহং-এর আদৌ কোনো অধিকার বা কর্তৃত্ব থাকে না। এর অর্থ, অহং সিংহাসন পরিত্যাগ করে। হেনরি মার্টিন এই অভিব্যক্তিটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ “প্রভু, আমার যেন নিজস্ব কোনো ইচ্ছা না-থাকে; অথবা, আমার জীবনের বাহ্যিক যে-কোনো ঘটনাতেই ক্ষুদ্রতম মাত্রাতেও যেন সুখ পেতে পারি, কিন্তু তা যেন তোমার ইচ্ছার অনুরূপ হয়।”

> মহিময় বিজয়ী আমার, স্বর্গের রাজকুমার
> আমার সমর্পিত হাত দুটি রাখো তোমার হাতে,
> আমার ইচ্ছাই আজ তোমার ইচ্ছা অবশেষে,
> সানন্দ সেবক পরিত্রাতার সিংহাসন সমীপে!
>
> —এইচ. জি. সি. মউল

৩. স্বেচ্ছায় ক্রুশ নির্বাচন

“কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক” (মথি ১৬ : ২৪)। ক্রুশ কোনো রকমের শারীরিক দুর্বলতা বা মানসিক যন্ত্রণা নয়—সকল মানুষের কাছেই এগুলি সাধারণ ঘটনা। ক্রুশ একটি পথ, যা স্বেচ্ছায় নির্বাচন করা হয়। ক্রুশ “একটি পথ যা জগতে অসম্মান ও নিন্দা বয়ে আনে” —সি. এ. কোটস্। ক্রুশ লজ্জা, নিগ্রহ এবং

কটূক্তির প্রতীক —যা জগৎ ঈশ্বর-পুত্রের উপর স্তূপাকার করেছে। যারা স্রোতের বিপরীতে চলতে চায়, জগৎ তাদের উপরেও লজ্জা-নিগ্রহ-কটূক্তির বোঝা চাপিয়ে দেবে। জগৎ ও জগতের পথের অনুরূপ হয়ে ওঠাই ক্রুশ থেকে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায়। বিশ্বাসী এই পথেই ক্রুশকে এড়িয়ে যেতে পারে।

৪. খ্রীস্টানুসরণে অতিবাহিত জীবন

"কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক" (মথি ১৬ : ২৪)।

এর অর্থ বুঝতে হলে নিজেকে প্রশ্ন করুন, "প্রভু যীশুর জীবনের বৈশিষ্ট্য কী?" তাঁর জীবন ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সমর্পিত। এই জীবন পবিত্র আত্মার শক্তিতে অতিবাহিত জীবন। এই জীবন অপরের নিঃস্বার্থ সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন। এই জীবন চরম বিচ্যুতির মধ্যেও ধৈর্য্যশীলতা ও দীর্ঘসহিষ্ণুতার জীবন। এই জীবন আকুল আকাঙ্ক্ষাময়, আত্ম-সংযমের, নম্রতার, দয়ার্দ্রতার, বিশ্বস্ততার এবং ঈশ্বর-অনুরক্তির (গালাতীয় ৫ : ২২, ২৩)। তাঁর শিষ্য হতে গেলে, আমাদের তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। সুনিশ্চিতভাবে, আমাদের খ্রীস্টসদৃশতার ফল প্রদর্শন করতে হবে (যোহন ১৫ : ৮)।

৫. খ্রীস্টের আপনজনদের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসা

"পরস্পরের প্রতি তোমাদের এই ভালোবাসা দেখেই সকলে জানবে, তোমরা আমার শিষ্য" (যোহন ১৩ : ৩৫)। এই ভালোবাসা একের চেয়ে অন্যকে বেশি মর্যাদা দিয়ে থাকে। এই ভালোবাসা সীমাহীন পাপকে আবৃত করে। এই ভালোবাসা দীর্ঘকালীন যন্ত্রণা ভোগ করে। এই ভালোবাসা দয়ার্দ্র হৃদয়ের পরিচয় দেয়। ভালোবাসা আত্মগর্ব করে না, এবং গর্বস্ফীত হয় না। ভালোবাসা অশোভন আচরণ করে না; স্বার্থের চেষ্টা করে না; সহজে প্ররোচিত হয় না; মন্দচিন্তা করে না। ভালোবাসা সবকিছু বহন করে, সবকিছু বিশ্বাস করে, সবকিছু প্রত্যাশা করে এবং সবকিছু সহ্য করে (১ করিন্থীয় ১৩: ৪-৭)। এই ভালোবাসা ছাড়া শিষ্যত্ব হবে শীতল, কঠোর তপশ্চর্যা।

৬. তাঁর বাক্যে অবিরাম অনুবৃত্তি

"যদি তোমরা আমার বাক্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হও, তা হলেই তোমরা হবে আমার প্রকৃত শিষ্য" (যোহন ৮ : ৩১)। প্রকৃত শিষ্যত্বের মধ্যে অবশ্যই অনুবৃত্তি থাকবে। খুব সুন্দরভাবে আরম্ভ করা, মহিমার দীপ্তিতে বিস্ফোরিত হওয়া সহজ। কিন্তু চরম ধৈর্য্যশীলতায় বাস্তবতার পরীক্ষা হয়। লাঙলে হাত দিয়ে যে পিছন ফিরে তাকায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের যোগ্য নয় (লুক ৯ : ৬২)। শাস্ত্রবাক্যের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন বাধ্যতা না

থাকলে তা কোনো কাজের নয়। খ্রীস্ট তাদেরই চান, যারা অবিরত, বিনাপ্রশ্নে তাঁর বাধ্য হবে।

পশ্চাদপসরণ থেকে আমাকে রক্ষা কর!
আমার লাঙলের হাতল চোখের জল সিক্ত,
হালের ফলা মরিচায় বিনষ্ট, তবু......তবু......
ঈশ্বর আমার! ঈশ্বর আমার! পশ্চাদপসরণ থেকে
আমাকে রক্ষা কর।

৭. তাঁর অনুগমনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ

"তোমাদের মধ্যে যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারবে না, সে আমার শিষ্য হতেপারবে না" (লুক ১৪ : ৩৩)।

শিষ্যত্ব সম্পর্কে খ্রীস্ট যে সমস্ত শর্তের কথা বলেছেন, সম্ভবত, এটিই সবচেয়ে অপ্রিয় শর্ত। এবং সম্ভবত বাইবেলের সবচেয়ে অপ্রিয় পদ। চতুর ঈশতত্ত্ববিদরা এর ভিন্নতর অর্থ প্রমাণ করতে গিয়ে হাজার হাজার কারণ দেখাতে পারেন, কিন্তু সরল প্রকৃতির শিষ্যরা যীশুর এই বাক্যটিকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করে। সর্বস্ব ত্যাগের অর্থ কী? এর অর্থ, সমস্ত জাগতিক সম্পদ যা অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়, এবং যা সুসমাচার বিস্তারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে—জীবন থেকে তা বাতিল করা। যে-মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করে, সে অস্থিরচিত্ত, অলস হতে পারে না। তার নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করে। কিন্তু তার জীবনের লক্ষ্যই হল, খ্রীস্টের রাজ্যবিস্তারকে ত্বরান্বিত করা; তাই, প্রভুর কাজের ক্ষেত্রে যা কিছু বর্তমান প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে, তার সবকিছুই সে প্রভুর উদ্দেশে বিসর্জন দেয়। তার ভবিষ্যৎকে তুলে দেয় ঈশ্বরের হাতে। ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁর ধার্মিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে সে বিশ্বাস করে যে, কোনোদিনই তার খাদ্য-বস্ত্রের অভাব হবে না। সুসমাচারের অভাবে মানুষ যখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সে সচেতনভাবে তার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে পারে না। পুঞ্জীভূত অর্থ-সম্পদ নিয়ে সে তার জীবনকে বিনষ্ট করতে পারে না। সে জানে, খ্রীস্ট যেদিন তাঁর পুণ্যজনদের জন্য প্রত্যাবর্তন করবেন, জাগতিক সবকিছুই তখন শয়তানের হস্তগত হবে। পৃথিবীতে ধন সঞ্চয়ের বিপক্ষে প্রভু যে সতর্কবাণী দিয়েছেন, সে তার বাধ্য হতে চায়। সর্বস্ব ত্যাগের মাধ্যমে, যা কিছু সে রক্ষা করতে পারে না, যা কিছু তার ভালোবাসাকে প্রতিরোধ করে তেমন সবকিছুই উৎসর্গ করে।

খ্রীস্টীয় শিষ্যত্বের সাতটি শর্তের কথা আলোচনা করা হল। এগুলির মধ্যে কোনো আলো-আঁধারি ভাব নেই। স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন। লেখক উপলদ্ধি করছেন, এগুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিজেকে অলাভজনক দাস হিসেবে দোষীকৃত করেছেন। কিন্তু ঈশ্বরের লোকদের ব্যর্থতার কারণে ঐশ্বরিক সত্য কি চিরকালের মতো দমিত হয়ে থাকবে? এ কথাই কি যথার্থ নয় যে, বাণীবাহকের চেয়ে বাণীই সর্বদা মহত্তর? এ কথাই কি যথার্থ নয় যে, ঈশ্বরই সত্য এবং মানুষ হবে মিথ্যাবাদী? আমরা কি এ কথাই বলব না, "আমার নিজের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে তোমারই ইচ্ছা সাধিত হোক?"

আমাদের বিগত দিনের ব্যর্থতাকে স্বীকার করে, আসুন, খ্রীস্ট আমাদের প্রতি যে-দাবি জানিয়েছেন, সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হই এবং মহিমময় প্রভুর প্রকৃত শিষ্য হবার পথানুসন্ধান করি।

প্রভু আমার, তোমার দ্বারের উদ্দেশে আমায় চালিত কর ঃ
আমার ইচ্ছুক কর্ণকে আর একবার বিদীর্ণ কর,
তোমার বন্ধনই স্বাধীনতা; কঠোর শ্রম ও সহ্য করতে,
তোমার বাধ্য হতে—আমাকে তোমার সঙ্গী হতে দাও।

এইচ. জি. সি. মউল

সর্বস্ব ত্যাগ

"তোমাদের মধ্যে যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারবে না, সে আমার শিষ্য হতে পারবে না" (লুক ১৪ : ৩৩)।

প্রভু যীশুর শিষ্য হতে গেলে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে। মুক্তিদাতার এই কথার এটাই অভ্রান্ত অর্থ। এই রকম "চরম" দাবির বিরুদ্ধে আমরা যতই আপত্তি তুলি; এই রকম "অসম্ভব" এবং "অজ্ঞোচিত" নীতির যতই বিরুদ্ধাচরণ করি, এ প্রভুর বাক্য—এটাই বাস্তব সত্য এবং তার বাক্য ও অর্থের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই।

আমাদের কয়েকটি রূঢ় সত্যের মুখোমুখি হতে হবে ঃ

ক) যীশু এক বিশেষ, নির্বাচিত শ্রেণির খ্রীস্টীয় কর্মীদের কাছে এই দাবি করছেন না। তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ....।"

খ) তিনি বলেননি যে, আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য শুধুই ইচ্ছুক হবে। তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারবে না..."।

গ) তিনি বলেননি যে, আমাদের সম্পত্তির একটা অংশ আমরা ত্যাগ করব। তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারবে না..."

ঘ) যীশু বলেননি, যে তার সম্পত্তি নিজের করে রেখে দেয়, সেও এক ধরনের শিষ্য হতে পারবে। যীশু বলেছিলেন, "... সে আমার শিষ্য হতে পারবে না।"

প্রকৃতপক্ষে, এই চরম দাবির জন্য আমরা বিস্মিত হতে পারি না, কারণ বাইবেলের একমাত্র প্রস্তাব এটাই।

যীশু কি বলেননি ঃ

"এই পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় কোরো না । এখানে তা পোকায় কাটে, মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যায়। চোরে সিঁদ কেটে চুরি করে। তোমরা বরং স্বর্গেই নিজের জন্য ধনসম্পদ সঞ্চয় কর"... (মথি ৬ : ১৯, ২০)?

ওয়েস্‌লি যথার্থই বলেছেন "আমাদের প্রভু ব্যভিচার ও নরহত্যার মতোই পৃথিবীতে ধনসম্পদকেও নিষিদ্ধ করেছেন।"

যীশু কি বলেননি ঃ

"তোমাদের সম্পত্তি বিক্রি করে বিলিয়ে দাও"... (লুক ১২ : ৩৩)?

ধনী যুবককে কি তিনি পরামর্শ দেননি ঃ

"......তোমার যা কিছু আছে, সমস্ত বিক্রি করে গরিবদের বিলিয়ে দাও, তা হলে স্বর্গে তোমার ধন সঞ্চিত হবে। তার পর এস, আমার অনুসরণ কর" (লুক ১৮ : ২২)?

তাঁর কথা এবং অর্থের মধ্যে যদি ভিন্নতা থাকে, তা হলে তিনি কী বলতে চেয়েছিলেন ?

আদিম মণ্ডলীতে দেখি, বিশ্বাসীরা "নিজেদের সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে যার যা প্রয়োজন তা মেটাতেন" ((প্রেরিত ২ : ৪৫) —এ কথা কি সত্য নয়?

এ কথাও কি সত্য নয় যে, ঈশ্বরের বহু পুণ্যাত্মা যীশুকে অনুসরণ করতে গিয়ে আক্ষরিক অর্থেই সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন?

বাগদাদ শহরের প্রাথমিক যুগের মিশনারি অ্যান্টনি নরিশ গ্রোভস এই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন যে, "তারা পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় করবেন না এবং প্রভুর সেবার জন্য.... তাঁদের উপার্জনের একটা মোটা অংশ তাঁরা ব্যয় করবেন"। গ্রোভস-এর এই কাহিনী তাঁর রচিত একটি পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সি. টি. স্টাড "খ্রীস্টের জন্য তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন এবং ধনী যুবকটি যে সুবর্ণসুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি, সেই সুযোগ—ঈশ্বরের লিখিত বাক্যের প্রতি সহজ বাধ্যতা—তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।" প্রভুর কাজের জন্য হাজার হাজার অর্থ বিতরণ করার পর, তাঁর নতুন স্ত্রীর জন্য ৯, ৫৮৮ পাউণ্ডের সমমূল্য অর্থ আলাদা করে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি চাননি, তাঁর স্বামী তাঁকে ছাড়িয়ে যাক। তিনি বললেন, "চার্লি, প্রভু যুবকটিকে কী করতে বলেছিলেন?"

স্বামী উত্তর দিলেন, "সব কিছু বিক্রি কর।"

"তা হলে, আমাদের বিবাহে প্রভুর কাছে সবকিছু সঠিকভাবে শুরু করব।" এবং সেই অর্থ বিভিন্ন খ্রীস্টীয় মিশনে প্রেরিত হল।

এই একই ভাবনা জিম ইলিয়টকেও প্রাণিত করেছিল। তাঁর দিনলিপিতে তিনি লিখেছিলেন ঃ

"পিতা, জগতের কোনো বস্তুকে যেন আঁকড়ে না থাকি, এ জন্য তুমি আমায় দুর্বল কর। আমার জীবন, আমার খ্যাতি, আমার সম্পত্তি, আমার বজ্রমুষ্টি হাতের চাপ, প্রভু, তুমি শিথিল করে দাও। এমন-কী পিতা, আমার ভালোবাসার বন্ধনও তুমি শিথিল কর। যা অনিষ্টকর নয় এমন আকাঙক্ষা, স্নেহের স্পর্শের জন্য আমার হাতের বন্ধন আমি মুক্ত করেছি। বরং, ক্যালভেরির সকল কাজে গ্রহণ করার জন্য আমার হাত তুমি মুক্ত করে দাও—খ্রীস্টের যেমন মুক্ত হয়েছিল—সমস্ত মুক্ত করে আমি যেন মুক্ত হতে পারি—এখন আমাকে যা কিছু বেঁধে রাখে, সে সব থেকে যেন মুক্ত হতে পারি। তিনি স্বর্গের কথা, ঈশ্বরের সঙ্গে সমরূপতার কথা ভেবেছিলেন; কোনো বস্তুকে আঁকড়ে থাকার বিষয়ে তিনি চিন্তা করেননি। আমার বজ্রমুষ্টিকে তুমি শিথিল করে দাও।"

আমাদের অবিশ্বাসী হৃদয় বলে যে, প্রভুর বাক্যকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা অসম্ভব। সর্বস্ব ত্যাগ করলে আমাদের অনাহারে থাকতে হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমাদের এবং আমাদের প্রিয়জনদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসী যদি সর্বস্ব ত্যাগ করে, প্রভুর কাজে কে অর্থ সাহায্য করবে? যদি বিত্তবান কিছু খ্রীস্ট-বিশ্বাসী না-থাকে, তা হলে উচ্চতর শ্রেণির মানুষের কাছে কী করে সুসমাচার প্রচার করা যাবে? এইভাবে পর পর অনেক যুক্তি চলে আসে —সবগুলোকে প্রমাণ করতে হবে যে, যীশু যা বলেছিলেন, তাঁর কথার অর্থ তা নয়।

আসল কথা হল, প্রভুর আদেশের প্রতি বাধ্যতাই সবচেয়ে বিবেকী এবং যুক্তিগ্রাহ্য জীবন এবং মানুষের জীবনে তা মহত্তম আনন্দ নিয়ে আসে। শাস্ত্রবাক্যের সাক্ষ্য এবং অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, যে-মানুষ খ্রীস্টের জন্য ত্যাগ-সর্বস্ব জীবন যাপন করে, সে কখনো অভাবগ্রস্ত হয় না। মানুষ যখন ঈশ্বরের বাধ্য হয়, প্রভু তার তত্ত্বাবধান করেন।

যে মানুষ খ্রীস্টের অনুসরণ করতে গিয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে, সে কখনো নিঃস্ব, রিক্ত নয়; সহ-বিশ্বাসীদের সাহায্যের প্রত্যাশা সে করে না।

১. সে পরিশ্রমী। নিজের এবং তার পরিবারের বর্তমান প্রয়োজন মেটাবার জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করে।

২. সে মিতব্যয়ী। সে যতদূর সম্ভব ব্যয়-সঙ্কোচ করে এবং এমনভাবে জীবন

যাপন করে যেন একান্ত দরকারি বিষয়ে ব্যয় করার পরেও উদ্বৃত্ত অর্থ প্রভুর কাজে ব্যয় করতে পারে।

৩. সে দূরদর্শী। পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় না-করে, সে স্বর্গে ধন সঞ্চয় করে।

৪. সে ভবিষ্যতের বিষয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে। তার জীবনের সর্বোত্তম সময়গুলি বৃদ্ধ-বয়সের নিরাপত্তার জন্য ব্যয় না-করে, তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কালটিকে খ্রীস্টের জন্য ব্যয় করে এবং ভবিষ্যতের জন্য তাঁরই উপর নির্ভর করে। সে বিশ্বাস করে, ঈশ্বরের রাজ্য এবং ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠার কাজকে যে অগ্রাধিকার দেয়, সে কখনো খাদ্য এবং পরিধেয়র অভাব বোধ করবে না (মথি ৬ : ৩৩)।

তার কাছে, দুর্দিনের জন্য ধন সঞ্চয় করা যুক্তিযুক্ত নয়। সে এইভাবে যুক্তি দেবে ঃ

১. আত্মার পরিত্রাণের জন্য যখন এখনই অর্থ ব্যয় করা দরকার, সেই সময় আমরা কীভাবে অতিরিক্ত অর্থ সচেতনভাবে মজুত করতে পারি? ''যদি কারো ধনসম্পদ থাকে এবং অভাবগ্রস্ত কোনো ভাইকে দেখেও যদি তার হৃদয়ে মমতা না হয়, তা হলে তার অন্তরে ঈশ্বর-প্রেমের স্থান কোথায়?'' (১ যোহন ৩ : ১৭)।

"আবার, গুরুত্বপূর্ণ আদেশটি বিবেচনা করে দেখুন—তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাস (লেবীয় ১৯ ঃ ১৮)। আমরা কি সত্যসত্যই বলতে পারি, নিজেদের মতো প্রতিবেশীকে ভালোবাসি, আমাদের দেবার মতো অনেক থাকা সত্ত্বেও যাকে আমরা অনাহারে থাকতে দিয়েছি? যে-মানুষ ঈশ্বরের অনির্বচনীয় দানকে জানার আনন্দময় অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তাকে কি আমি মিনতি করতে পারি না —'শত শত পৃথিবীর বিনিময়ে তুমি কি এই দানকে হস্তান্তর করবে?' যার দ্বারা মানুষ এই পবিত্র জ্ঞান এবং স্বর্গীয় সান্ত্বনা লাভ করতে পারে, তা যেন আঁকড়ে ধরে না-থকি।''

এ. এন. গ্রোভস্

২. আমরা যদি সত্যিসত্যিই বিশ্বাস করি যে, খ্রীস্টের আগমন আসন্ন, তা হলে আমাদের অর্থ আমরা এখনই ব্যয় করতে চাইব। না হলে, এই অর্থ শয়তানের হস্তগত হবার ঝুঁকি থেকে যায় —অথচ, এই অর্থ চিরন্তন আশীর্বাদ লাভের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারত।

৩. আমাদের থাকা সত্ত্বেও, সেই অর্থ যদি আমরা খ্রীস্টীয় কাজের জন্য ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক থাকি, তা হলে সেই কাজে অর্থ জোগান দেবার জন্য আমরা সচেতনভাবে প্রভুর কাছে কী করে প্রার্থনা করব? খ্রীস্টের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ আমাদের প্রার্থনায় ভণ্ডামি থেকে রক্ষা করে।

৪. সত্যের কিছু কিছু ক্ষেত্রে—যেমন এই ক্ষেত্রে—ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে আমরা যদি ব্যর্থ হয়ে থাকি, তা হলে অন্যদের আমরা কীভাবে ঈশ্বরের পূর্ণাঙ্গ উপদেশ শিক্ষা দেব? এই রকম ক্ষেত্রে আমাদের মুখে কোনো ভাষা জোগাবে না।

৫. জগতের চতুর লোকেরা ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চয় করে রাখে। এ বিশ্বাস-নির্ভর জীবনযাত্রা নয়। খ্রীস্টবিশ্বাসীরা ঈশ্বর-নির্ভর জীবনযাপনের জন্য আহূত। খ্রীস্টবিশ্বাসী যদি জগতে ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করে, তা হলে জগতের থেকে সে আলাদা প্রকৃতির হল কীভাবে?

সব সময় এই যুক্তি উত্থাপিত হয় যে, আমাদের পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য আমরা সঞ্চয় করব। তা না করলে আমরা অবিশ্বাসীদের চেয়েও নিকৃষ্ট প্রকৃতির হব। এই যুক্তির সমর্থনে তারা বাইবেল থেকে দুটি পদ উল্লেখ করে থাকে ঃ

কোনো ব্যক্তি যদি তার আত্মীয়-স্বজনদের, বিশেষ করে নিজের পরিবারের লোকদের কথা চিন্তা না করে, তা হলে সে তার খ্রীস্টবিশ্বাস ত্যাগ করেছে। তার অবস্থা অবিশ্বাসীদের চেয়েও মন্দ। (১ তীমথি ৫ : ৮)।

পিতামাতার জন্য সন্তানদের নয়, বরং সন্তানদের জন্য পিতামাতার সংস্থান করা উচিত। (২ করিন্থীয় ১২ : ১৪)

এই পদগুলিকে সযত্নে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব, এখানে *বর্তমান প্রয়োজনের* কথা বলা হয়েছে, *ভবিষ্যতের* কথা বলা হয়নি।

দ্বিতীয় পদটিতে পৌল 'আয়রনি' ব্যবহার করেছেন। তিনি পিতামাতার স্থলাভিষিক্ত, এবং করিন্থীয়রা সন্তানবৎ। তিনি তাদের উপর অর্থনৈতিক বোঝা চাপাননি, যদিও প্রভুর দাসরূপে তাঁর সম্পূর্ণ সেই অধিকার ছিল। সর্বোপরি, সমবিশ্বাসী রূপে তিনি ছিলেন তাদের পিতৃসম। এবং সাধারণত পিতামাতারা সন্তানদের জন্য অন্নের সংস্থান করে, সন্তানরা পিতামাতাদের জন্য নয়। এখানে, সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য পিতামাতার সংস্থানের বিষয়টি আদৌ বিচার্য নয়। সমস্ত অধ্যায়টিতে পৌলের বর্তমান প্রয়োজন পূরণের দিকটিই তুলে ধরা হয়েছে, তাঁর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রয়োজনের কথা বলা হয়নি।

১ তীমথি ৫ : ৮ পদে, প্রেরিতশিষ্য দরিদ্র বিধবাদের তত্ত্বাবধানের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। তিনি গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন যে, তাদের আত্মীয়-স্বজনের উপরই তাদের সেবাযত্নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। যদি তাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন না থাকে, বা তারা যদি দায়িত্ব নিতে অপারগ হয়, তখন স্থানীয় মণ্ডলীই তাদের তত্ত্বাবধান করবে। কিন্তু এখানে আবার সেই বর্তমানের প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে, ভবিষ্যতের নয়।

ঈশ্বর চান, খ্রীস্টদেহের সদস্যরা সহবিশ্বাসীদের একান্ত প্রয়োজনগুলি পূরণ করবে ঃ

"......সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য বর্তমানে তোমাদের উদ্বৃত্ত থেকে তাদের অভাব

পূরণ কর যেন পরে কোন সময়ে তাদের উদ্বৃত্ত থেকে তোমাদের অভাব পূরণ হতে পারে। এইভাবেই সমতা বজায় রাখা যাবে। শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, ''যে বেশি সংগ্রহ করল, তার উদ্বৃত্ত কিছু থাকল না এবং যে একা সংগ্রহ করল, তার ঘাটতি হল না''। (২ করিন্থীয় ৮ : ১৪-১৫)।

কোনো খ্রীস্টবিশ্বাসী যখন মনে করে, ভবিষ্যতের জন্য সে সঞ্চয় করবে, সে একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়—সে জানে না, কোন পরিমাণটা 'যথেষ্ট' হবে। তাই ভবিষ্যতের জন্য অনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয়ের পিছনে সে তার জীবনপাত করে, এবং প্রভু যীশুকে সর্বোত্তম বস্তু দান করার সুযোগ উপেক্ষা করে। অপব্যয়িত জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে সে দেখে, সে যদি শুধু প্রভুর জন্য সর্বান্তঃকরণে জীবন যাপন করত, তা হলে যে-কোনো ভাবেই হোক, তার প্রয়োজন পূরণ করা হত।

সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসী প্রভুর বাক্যকে যদি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করত, তা হলে প্রভুর কাজে অর্থের কোনো অভাব ঘটত না। সুসমাচার বর্দ্ধিত শক্তিতে এবং বর্দ্ধিত পরিমাণে প্রচারিত হত। কোনো বিশেষ শিষ্য যদি অনটনে পড়ে, অন্যান্য শিষ্যদের কাছে তা আনন্দ ও সুযোগের কারণ হবে—তাদের যা আছে, তা ভাগ করে নেবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

এই জগতের বিত্তবান মানুষদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেবার জন্য বিত্তবান খ্রীস্টবিশ্বাসীদের থাকা দরকার—এমন ধ্যানধারণা একেবারেই অবাস্তব। পৌল বন্দি অবস্থাতেই সিজারের পরিজনদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন (ফিলিপীয় ৪ : ২২)। আমরা ঈশ্বরের বাধ্য হলে তাঁর উপর নির্ভর করতে পারি।

এই আলোচ্য বিষয়ের উপসংহারে প্রভু যীশুকে উদাহরণ স্বরূপ উপস্থিত করা যেতে পারে। সেবক কখনো তার প্রভুর ঊর্ধ্বে হয়। ''এই পৃথিবীতে প্রভু ছিলেন দরিদ্র, অবমাণিত এবং অবজ্ঞাত; সেবকের ধনী, মহান, সম্মানিত হবার বাসনা যথাযথ নয়''—জর্জ মূলার।

''খ্রীস্টের দুঃখভোগের মধ্যে ছিল দরিদ্রতা''—২ করিন্থীয় ৮ : ৯। অবশ্য, দরিদ্রতা বলতে ছিন্নকন্থা এবং ধূলিমলিন পোশাক বোঝায় না; দরিদ্রতার অর্থ, বিলাসিতা করার মতো অর্থের অপ্রতুলতা। ....প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে .... অ্যাণ্ডু ম্যুরে বলেছিলেন, ''প্রভু এবং তাঁর প্রেরিতশিষ্যরা প্রকৃত অর্থে দরিদ্র না-হলে, তাঁদের সাধিত কাজ সম্পন্ন করতে পারতেন না। যে-মানুষ অপরকে উন্নত করবে, তাকে অবশ্যই, সামারীয়র মতো অবনত হতে হবে, এবং বেশি সংখ্যক মানুষ দরিদ্র ছিল এবং এখনো আছে।''

—এ. এন. গ্রোভস

লোকেরা বলে থাকে, কিছু কিছু জাগতিক সম্পত্তি রয়েছে, পারিবারিক জীবনে যার প্রয়োজনীয়তা আছে। এ কথা সত্য।

লোকেরা বলে থাকে, ব্যবসায় পরিচালনার জন্য খ্রীশ্চান-ব্যবসায়ীদের বেশ কিছু পরিমাণ মূলধন থাকতে হবে। এ কথা সত্য।

লোকেরা বলে থাকে, আরো অনেক জাগতিক সম্পত্তি রয়েছে—যেমন, গাড়ি—যা প্রভুর গৌরবের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এ কথাও সত্য।

কিন্তু এই সমস্ত ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজন সত্ত্বেও সুসমাচার বিস্তারের জন্য খ্রীস্ট-বিশ্বাসীদের মিতব্যয়িতার এবং ত্যাগের জীবন যাপন করতে হবে, তার লক্ষ্য হওয়া উচিত—"কঠোর পরিশ্রম কর, অল্প ব্যয় কর, অনেক দান কর—এবং সমস্তই খ্রীস্টের উদ্দেশে।" (এ. এন. গ্রোভস)

সর্বস্ব ত্যাগের অর্থ উপলব্ধি করার জন্য আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ। একজন বিশ্বাসী আর একজনের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না; প্রত্যেক বিশ্বাসী প্রভুর সামনে তার নিজস্ব আচরণের ফল অনুসারে সক্রিয় হবে। এ একান্তভাবেই ব্যক্তিগত বিষয়।

যদি এই ধরনের আচরণ অনুসারে, কোনো বিশ্বাসীকে প্রভু এ যাবত অজানা এমন এক অনুরক্তির মাত্রায় নিয়ে যান, তবে সেখানে ব্যক্তিগত গর্বের কোনো স্থান নেই। ক্যালভেরির আলোকে দেখলে আমাদের কোনো ত্যাগই ত্যাগের পর্যায়ভুক্ত নয়। এ সমস্ত ছাড়াও, যা আমরা কোনোভাবেই রাখতে পারি না, এবং যা আমাদের ভালোবাসাকে নিবৃত্ত করে, আমরা শুধু তা-ই দিই প্রভুকে।

শিষ্যত্বের প্রতিবন্ধক

যে খ্রীস্টানুসরণে যাত্রা শুরু করবে, তাকে জানতে হবে, তাকে পথভ্রান্ত করার জন্য বহু প্রতিবন্ধকতা আসবে। খ্রীস্টের পথ থেকে ফিরে যাবার জন্য তার সামনে বহু সুযোগ আসবে। অন্য বহু কণ্ঠস্বর তাকে ডাকবে, ক্রুশের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য বহু প্রলোভন দেখাবে। আত্মোৎসর্গ এবং আত্মদানের পথ থেকে সরিয়ে নেবার জন্য দ্বাদশ বাহিনী দূত প্রস্তুত থাকবে।

তিন ভাবী শিষ্যর কাহিনীতে এই বিষয়টি ব্যাখ্যাত হয়েছে। তারা খ্রীস্টের মাহাত্ম্যের চেয়ে অন্য আহ্বানের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল।

> "তাঁরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় একটি লোক তাঁকে বলল, 'আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানেই আপনার অনুসরণ করব।' যীশু তাকে বললেন, 'শিয়ালের গর্ত আছে, আকাশের পাখিদের বাসা আছে, কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজার স্থান নেই'। তার পর একজনকে তিনি বললেন, 'আমায় অনুসরণ কর।' কিন্তু সে বলল, 'প্রভু, আগে আমার বাবাকে কবর দিয়ে আসতে অনুমতি দিন।'

যীশু তাকে বললেন, মৃতরাই মৃতদের কবর দিক। কিন্তু তুমি যাও, ঈশ্বরের রাজ্যের কথা ঘোষণা কর।' আর একজন বলল, 'প্রভু, আমি আপনার অনুসরণ করব, কিন্তু তার আগে আমাকে আমার বাড়ির সকলের কাছে বিদায় নিতে দিন।' যীশু তাকে বললেন, 'লাঙ্গলে হাত রেখে যে পিছন ফিরে চায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের যোগ্য নয়'।'' (লুক ৯ : ৫৭-৬২)

তিনজন নাম-না-জানা মানুষ যীশুর মুখোমুখি হয়েছিল। তারা যীশুকে অনুসরণ করার এক তীব্র আবেগ উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু তাদের আত্মা এবং যীশুর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের মাঝে অন্য কিছু বিষয়কে আসার অনুমতি দিয়েছিল।

শ্রীযুক্ত ব্যস্তবাগিশ মহাশয়

প্রথম লোকটির নাম দেওয়া হয়েছে, শ্রীযুক্ত ব্যস্তবাগিশ। সে আবেগবশত প্রভু যীশুকে যে-কোনো স্থানেই অনুসরণ করতে চেয়েছিল। ''আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানেই আপনার অনুসরণ করব।'' কোনো মূল্য তার কাছে বড়ো নয়। কোনো ক্রুশই তার কাছে ভারি নয়। কোনো পথই তার কাছে বন্ধুর নয়।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, শ্রীযুক্ত ব্যস্তবাগিশ মহাশয়ের ইচ্ছুক-হৃদয়-প্রস্তাবের সঙ্গে প্রভুর দেওয়া উত্তরের কোনো সম্পর্ক নেই। যীশু বলেছিলেন, ''শিয়ালের গর্ত আছে। আকাশের পাখিদের বাসা আছে, কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজার স্থান নেই।'' প্রকৃতপক্ষে, প্রভুর উত্তর সবচেয়ে যথাযথ ছিল। তিনি যেন বলতে চেয়েছিলেন, ''তুমি আমাকে যে-কোনো স্থানে অনুসরণ করার কথা বলছ, কিন্তু জীবনের পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যকে ছাড়তে কি রাজি আছ? আমার চেয়ে শিয়ালরা আরো অনেক বেশি সুখভোগ করে। পাখিদেরও নিজস্ব বাসা আছে। কিন্তু যে-জগৎ আমার সৃষ্টি, সেই জগতেই আমি গৃহহীন, ভবঘুরে। আমাকে অনুসরণ করতে গিয়ে তুমি কি ঘরের নিরাপত্তাকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছ? আমাকে সেবা করার জন্য জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে কি ইচ্ছুক আছ?

আপাতভাবে লোকটি রাজি ছিল না, কারণ পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থে আমরা তার সম্পর্কে আর কোনো উল্লেখ দেখতে পাই না। খ্রীস্টের প্রতি অনুরক্তির চেয়ে তার মধ্যে পার্থিব ভোগবাসনাই প্রবল ছিল।

শ্রীযুক্ত শ্লথগতি মহাশয়

দ্বিতীয় লোকটিকে বলা হয়েছে, শ্রীযুক্ত শ্লথগতি মহাশয়। প্রথম লোকটির মতো সে স্বেচ্ছায় যীশুর অনুগামী হতে চায়নি; বরং, যীশু তাকে অনুগামী হতে বলেছিলেন।

যীশুর আহ্বান সে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেনি। এমন নয় যে, প্রভুর প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। বরং, সে তার কিছু কাজ প্রথমেই করতে চেয়েছিল। এটাই ছিল তার বড়ো পাপ। খ্রীস্টের দাবির চেয়ে নিজের দাবিকে সে বড়ো করে দেখেছিল। তার উত্তরটি লক্ষ করুন, "প্রভু, আগে আমার বাবাকে কবর দিয়ে আসতে অনুমতি দিন"।

সন্তান তার পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে, এ তো খুবই ন্যায়সঙ্গত। এবং পিতার যদি মৃত্যু হয়, খ্রীস্টবিশ্বাস অনুসারে পিতার সমাধির ব্যবস্থা করা সন্তানের কর্তব্য।

কিন্তু জীবনের এই ন্যায়সঙ্গত সৌজন্যও পাপময় হয়ে ওঠে, যখন প্রভু যীশুর চেয়েও তাকে বেশি অগ্রাধিকার দিই। এই লোকটির জীবনের প্রকৃত ইচ্ছা তার নগ্ন অনুরোধের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, "প্রভু.....আগে আমার.....।" বলা যেতে পারে, তার মধ্যে যে-অহংবোধ অন্তঃসলিলা অবস্থায় ছিল, তার উক্তিটি সেই অহং-কে গোপন করার এক প্রয়াস।

আপাতভাবে, সে উপলব্ধি করেনি যে, "প্রভু, ...আমাকে প্রথমে......" তার এই কথাগুলি নীতিগতভাবে হাস্যকর এবং অসম্ভব। খ্রীস্টই যদি তার প্রভু হন, তা হলে, তিনিই অগ্রাধিকার লাভ করবেন। কিন্তু "আমি" যদি বড়ো হয়ে দেখা দেয়, তা হলে খ্রীস্ট আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত শ্লথগতি মহাশয়কে একটি কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং এই কাজটিকে সে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। সেই কারণে যীশু সঠিকভাবেই তাকে বলেছিলেন, "মৃতরাই মৃতদের কবর দিক। কিন্তু তুমি যাও, ঈশ্বরের রাজ্যের কথা ঘোষণা কর।" এই কথাগুলির ভাবানুবাদ করে এইভাবে বলা যেতে পারে ঃ "কতকগুলি বিষয় আছে যা আত্মিকভাবে মৃত মানুষেরা বিশ্বাসীদের মতোই করতে পারে। কিন্তু জীবনের আরো কতকগুলি বিষয় আছে যা শুধু বিশ্বাসীরাই করতে পারে। দেখবেন, একজন পরিত্রাণহীন মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করতে পারে, আপনি ঠিক সেভাবে জীবনযাপন করবেন না। আত্মিকভাবে মৃত মানুষদের দৈহিক মৃত মানুষদের কবর দিতে দিন। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে হোক অপরিহার্য। পৃথিবীতে আমার রাজ্যবিস্তারই হোক আপনার জীবনের মূল লক্ষ্য।"

দেখে মনে হয়, শ্রীযুক্ত শ্লথগতি মহাশয়কে এ জন্য অনেক বেশি মূল্য দিতে হবে। এক সীমাহীন নীরবতায় সে সময়ের স্তরকে অতিবাহিত করল।

প্রথম লোকটি যদি শিষ্যত্বের ক্ষেত্রে জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় লোকটি একটি চাকরি বা পেশার দৃষ্টান্ত এবং সেই চাকরি বা পেশাকে সে খ্রীস্টীয় অস্তিত্বের প্রধান কারণের উপরে স্থান দিয়েছে। খ্রীস্টীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যত্র

চাকরি নেওয়ার মধ্যে কোনো ভুল নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই ঃ মানুষ তার নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কাজ করবে। কিন্তু প্রকৃত শিষ্যত্বের জীবন দাবি করে যে, প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁর ধার্মিকতার সন্ধান করতে হবে; পরিত্রাণহীন মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে, বিশ্বাসী সেভাবে জীবন যাপন করবে না, এবং চাকরির প্রাথমিক শর্ত শুধু প্রয়োজন মেটানো, কিন্তু খ্রীস্টবিশ্বাসীর প্রাথমিক লক্ষ হবে ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে প্রচার করা।

শ্রীযুক্ত অনায়াস মহাশয়

তৃতীয় লোকটিকে বলা হয়েছে, শ্রীযুক্ত অনায়াস মহাশয়। প্রথম লোকটির মতো সে-ও প্রভুকে অনুসরণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় লোকটির সঙ্গেও তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সে-ও কতকগুলি আপাতবিরোধী উক্তি করেছিল, "প্রভু, ... প্রথমে আমাকে.....।" সে বলেছিল "প্রভু আমি আপনার অনুসরণ করব, কিন্তু তার আগে আমাকে আমার বাড়ির সকলের কাছে বিদায় নিতে দিন।"

আরো একবার আমরা স্বীকার করব যে, তার এই অনুরোধের মধ্যে কোনো অন্যায় নেই। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা বা তাদের ছেড়ে যাবার সময় বিদায় নেবার সৌজন্য প্রদর্শন করা ঈশ্বরের নীতির পরিপন্থী নয়। তা হলে, কোন কারণে এই মানুষটি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হল? এর কারণ —খ্রীস্টের স্থলে সে তার কোমল প্রকৃতিকে লালন করেছিল।

তাই খ্রীস্ট তার অন্তরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেন, "লাঙ্গলে হাত রেখে যে পিছন ফিরে চায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের যোগ্য নয়।" অন্যভাবে বলা যায়, "তুমি যেমন দেখালে, আমার শিষ্যরা তেমন আত্মকেন্দ্রিক, কোমল উপাদানে তৈরি নয়। যারা গৃহের বন্ধনকে অস্বীকার করে, যারা আত্মীয়-স্বজনের চোখের জলে বিহ্বল হবে না, যারা তাদের জীবনে আমাকেই অগ্রাধিকার দেবে —আমি এমন মানুষদেরই চাই।"

আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হই যে, শ্রীযুক্ত অনায়াস মহাশয় যীশুকে পরিত্যাগ করে, দু:খিত মনে রাস্তা দিয়ে চলে গিয়েছিল। তার যীশুর শিষ্যত্ব বরণের অত্যধিক আস্থাপূর্ণ বাসনা পারিবারিক বন্ধনের প্রস্তরাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। হতে পারে, তার ক্রন্দনশীলা মা হয়তো তাকে বলেছিল, "তুমি যদি আমাকে ত্যাগ করে মিশনক্ষেত্রে যাও, তোমার মায়ের হৃদয়কে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে।" সে কে, আমরা তা জানি না। আমরা শুধু জানি যে, এই দুর্বলচিত্ত মানুষটি, যে ফিরে গিয়েছিল এবং তার জীবনের মহত্তম সুযোগকে অবহেলায় হারিয়েছিল, বাইবেলে তার সম্পর্কে আর কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। সে ঈশ্বরের রাজ্যের যোগ্য নয়।

সারাংশ

এখানে তিনজন লোকের মধ্য দিয়ে প্রকৃত শিষ্যত্বের মৌল প্রতিবন্ধকগুলি বর্ণিত হয়েছে। তারা যীশুর সঙ্গে সমস্ত পথ চলতে আগ্রহী ছিল না।

শ্রীযুক্ত ব্যস্তবাগিশ মহাশয়—পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ভালোবাসা
শ্রীযুক্ত শ্লথগতি মহাশয়—চাকরি অথবা পেশাকে অগ্রাধিকার দান
শ্রীযুক্ত অনায়াস মহাশয়—পারিবারিক সম্পর্ককে আগ্রাধিকার দান

যীশুকে যারা সাহস ও ত্যাগের সঙ্গে অনুসরণ করবে, তিনি বিভিন্ন নর-নারীকে যেমন আগে আহ্বান করেছেন, আজও তেমনই তাদের আহ্বান করছেন।

খুব কম মানুষই সেই আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী।

যীশু, আমার ক্রুশ আমি তুলে নিয়েছি,
সর্বস্ব ত্যাগ করে তোমার অনুসারী হয়েছি।
উলঙ্গ, দরিদ্র, অবজ্ঞাত, পরিত্যক্ত—
তুমি, এখন থেকে আমার হবে সর্বস্ব।
আমি যা কিছুর সন্ধান করেছি, যা কিছু জেনেছি,
আমার সমস্ত প্রত্যাশা এবং ভালোবাসার উচ্চাশা—
সব তুমি ধ্বংস কর।
কত সম্পদশালী আমি,
ঈশ্বর এবং স্বর্গ—
এখনো আমারই নিজস্ব।

জগৎ আমাকে ঘৃণা করুক, করুক পরিত্যাগ,
তারা তো আমার পরিত্রাতাকেও করেছে
ঘৃণা, পরিত্যাগ করেছে তাঁকে;
মানবিক হৃদয় এবং বাহ্যিক অবয়ব
প্রতারিত করেছে আমায়—
তাদের মতো তুমি অসত্য নও;
যখন আমার প্রতি সদয় হও—
জ্ঞান-ভালোবাসা ও শৌর্যের ঈশ্বর—
শত্রুরা ঘৃণা করতে পারে, বন্ধুরা পারে অবজ্ঞা করতে।
শুধু তোমার শ্রীমুখ প্রদর্শন কর, সব কিছুই হবে
আলোয় বিভাসিত।

—এইচ. এফ. লাইট

শিষ্যরা দেওয়ান

লুক ১৬ : ১—১৩ পাঠ করুন

অবিশ্বস্ত দেওয়ানের কাহিনীটি শিষ্যদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। এর মধ্যে পরিত্রাতা যেসব নীতি স্থাপন করেছেন, তা সর্বকালের শিষ্যদের সম্পর্কে প্রযুক্ত। সর্বোপরি, খ্রীস্টের শিষ্যরা আবশ্যিকভাবেই দেওয়ান—ঈশ্বরের সম্পদ এবং পৃথিবীতে তাঁর স্বার্থ —এর দায়িত্ব তাদেরই উপর ন্যস্ত হয়েছে।

রূপকটি সমস্যা-কণ্টকিত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কাহিনীটিতে যেন অসাধুতা এবং কূটকৌশলের প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু যথার্থ আলোকে উপলব্ধি করলে বুঝতে পারি, এর মধ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ বিবৃত রয়েছে।

সংক্ষেপে কাহিনীটি হল ঃ এক সম্পদশালী ব্যক্তি তাঁর ব্যবসায় দেখাশোনার জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন। এক সময় মালিক জানতে পারলেন, এই কর্মচারীটি তাঁর অর্থ তছনছ করছে। তৎক্ষণাৎ তিনি হিসাবপত্র চাইলেন এবং তার পর, তাকে চাকরি থেকে বরখাস্তের নোটিশ দিলেন।

কর্মচারী তার আগামী দিনগুলির অনিশ্চিত ও ভয়াবহ অবস্থা বুঝতে পারল। তার যথেষ্ট বয়স হয়েছে—কঠোর পরিশ্রম করার সাধ্য নেই; কায়িক শ্রমও করতে পারবে না; লোকের কাছে ভিক্ষা করতেও তার লজ্জা হবে। তাই সে একটা কৌশল স্থির করল—সেই কৌশলের জোরেই ভবিষ্যতে সে তার বন্ধুদের সহায়তা লাভ করতে পারবে। সে তার মালিকের একজন খাতকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আমার মনিবের কাছে তোমার ধার কত?" সে বলল, "একশো মন তেল।" দেওয়ান তাকে বলল, "এই নাও তোমার খত, ...এতে পঞ্চাশ লেখ।" তার পর সে আর একজনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার দেনা কত?" সে বলল, "একশো বস্তা গম।" দেওয়ান বলল "ঠিক আছে, তুমি আশি বস্তা শোধ দিয়ো। তা হলেই তোমার সমস্ত দেনা শোধ হয়ে গেছে বলে মনে করব।"

অসৎ কর্মচারীটির কাজ আমাদের যত না আঘাত করে, তার সম্পর্কে যে মন্তব্যটি করা হয়েছে, তা আমাদের আরো বেশি বিস্মিত করে ঃ

"সেই অসৎ দেওয়ান বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছিল বলে তার মনিব তার প্রশংসা করলেন। বাস্তবিক, এই যুগের জাগতিক মনোভাবাপন্ন লোকেরা তাদের সমকালীন আলোকপ্রাপ্ত লোকদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান।" (৮ পদ)

ব্যবসায়ের এই অসৎ মনোবৃত্তিকে যে-আপাতভাবে সমর্থন জানানো হল, এ সম্পর্কে আমরা কী বুঝব?

একটি বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। তার মনিব এবং আমাদের প্রভু —কেউই তার এই কাজের প্রশংসা করেননি। তার জীবনের বক্রতার জন্যই সে কর্মচ্যুত হয়েছিল। এই ধরনের প্রতারণা এবং অবিশ্বস্ততাকে কোনো ধর্মপ্রাণ মানুষই সমর্থন করতে পারে না। রূপক কাহিনীটি যা-ই শিক্ষা দিক, অর্থ আত্মসাৎ করাকে তা কখনোই সমর্থন করে না।

শুধু একটি কারণেই অসৎ দেওয়ানের প্রশংসা করা যেতে পারে —সে ভবিষ্যতের জন্য একটা পরিকল্পনা রচনা করেছিল। তার দেওয়ানত্ব চলে গেলেও সে অন্যদের বন্ধুত্ব লাভ করতে পারবে —এই নিশ্চয়তা লাভের জন্যই সে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। সে "বর্তমানের" পরিবর্তে "ভবিষ্যতের" জন্য কাজ করেছিল।

রূপকের বক্তব্য হল তা-ই। জাগতিক লোকেরা ভবিষ্যৎ দিনের সংস্থানের জন্য কাজ করে। তারা শুধু তাদের বৃদ্ধ বয়সের অবসরের দিনগুলির কথাই চিন্তা করে। তাই, যখন তারা আর লাভজনক চাকরি করতে পারবে না, সেই দিনগুলিতে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের জন্য তারা কঠোর পরিশ্রম করে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য তারা সর্বত্র ঢুঁ মারে।

এই বিষয়ে, পরিত্রাণহীন মানুষেরা পরিত্রাণপ্রাপ্তদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। এর 'কেন' উত্তর বোঝার জন্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, খ্রীস্টবিশ্বাসীদের ভবিষ্যৎ এই জগতে নয়, স্বর্গে। এটাই চরম বিষয়। অবিশ্বাসীদের কাছে ভবিষ্যতের অর্থ, বর্তমান এবং মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়। ঈশ্বর-সন্তানদের কাছে ভবিষ্যতের অর্থ, খ্রীস্টের সঙ্গে অনন্তকালীন বাস।

তা হলে, রূপকটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, পরিত্রাণহীন মানুষেরা পৃথিবীতে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খ্রীস্টবিশ্বাসীদের চেয়ে (যারা স্বর্গের ভবিষ্যতের জন্য আগ্রহী) বেশি বুদ্ধিমান এবং সক্রিয়।

এই পটভূমিকায়, প্রভু যীশু এই অংশের ব্যবহারিক প্রয়োগ উপস্থাপন করেছেন ঃ

> "আমি তোমাদের বলছি, জাগতিক সম্পদ দিয়ে তোমরা মৈত্রী অর্জন কর, যেন ধন-সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেলে শাশ্বত-লোকে তোমরা স্থান পেতে পার।"

অর্থ এবং জাগতিক সম্পদই অধার্মিকের দেবতা। এই সমস্ত জিনিস আমরা খ্রীস্টের পক্ষে আত্মাকে জয় করার কাজে ব্যবহার করতে পারি। অর্থের বিশ্বস্ত ব্যবহারের দ্বারা যে-মানুষদের জয় করা হয়েছে, এখানে তাদের 'বন্ধু' রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এমন এক দিন আসছে, যেদিন আমরা ব্যর্থ হব (হয় আমরা মৃত্যুবরণ করব, অথবা দ্বিতীয় আগমনের সময় খ্রীস্টের সঙ্গে সম্মিলিত হব)। আমাদের জাগতিক সম্পদের বিজ্ঞজনোচিত ব্যবহারের ফলে যে-মানুষদের আমরা জয় করতে পেরেছি, আমাদের সেই শাশ্বত আবাসে সেদিন তারা আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য অপেক্ষা করবে।

চ) সবশেষে, ধনদৌলত মানুষের চরিত্রকে নষ্ট করে দেয়—তার মনে গর্বভাব আনে (হিতোপদেশ ২৮ : ১১) এবং অপরের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে (হিতোপদেশ ১৮ : ২৩; যাকোব ২ : ৫-৭)।

ম্যাথু হেনরি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ‘‘ধনের হিব্রু শব্দটির তাৎপর্য ‘গুরুভার’। ধনসম্পত্তি এক বোঝা—ধন অর্জনের পর তা তত্ত্বাবধান করার বোঝা, সেগুলি রক্ষা করার ভীতিকর বোঝা, প্রলোভনের বোঝা, দু:খ-বেদনার বোঝা, এবং সেগুলির হিসাব রাখার বোঝা।’’

৮. ‘‘এই সংসারে যারা ধনী তাদের বল তারা যেন অহংকার না করে, মায়াময় ঐশ্বর্যের উপর ভরসা না রাখে। কিন্তু তাদের বল, যিনি আমাদের ভোগের জন্য সবকিছু দেন, সেই ঈশ্বরের উপর-ভরসা রেখে তারা যেন পরসেবাব্রতী হয়, সৎকর্মের সম্পদে সমৃদ্ধ হয়, মুক্তহস্তে দান করে এবং সকলকে তাদের সমাজের ভাগীদার মনে করে। এইভাবে তারা ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ী সম্পদ সঞ্চয় করে যথার্থই জীবনের অধিকারী হবে’’ (১ তীমথি ৬ : ১৭-১৯)।

এই পদগুলিতে আমাদের বলা হয়েছে, ‘‘.....যারা ধনী তাদের বল....।’’ তবু কতজন ঈশ্বরের পরিচারক এই আদেশ সম্পাদন করবেন? আমরা কতজন ধনীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তর্জনী তুলেছি? আমাদের অধিকাংশ এই পদের উপদেশটিও *শুনিনি*। তবু, আজকের মতো সম্ভবত আর কখনই এই উপদেশের এমন প্রয়োজনীয়তা আসেনি।

এই উপদেশটি প্রচার করতে হলে, প্রথমে আমাদের নিজেদেরই বাধ্য হতে হবে। বিশ্বাসের পরিবর্তে আমরা যদি দৃশ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করি, তা হলে, অন্যদের আমরা পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় না-করার কথা বলতে পারি না। আমাদের জীবন আমাদের মুখ বন্ধ করে দেবে।

ঈশ্বর এমন মানুষদের সন্ধান করছেন যারা পরিণতির কথা না-ভেবে নির্ভয়ে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করবে। তিনি সন্ধান করছেন আমোষের মতো ব্যক্তিকে যিনি সরবে বলেছিলেন ঃ

> হে শমরিয়ার গিরিবিহারিণী বাশনের গাভী সকল, এই বাক্য শুন; তোমরা দীনহীন লোকদের প্রতি উপদ্রব করিতেছ, দরিদ্রগণকে চূর্ণ করিতেছ, এবং আপনাদের কর্তাদিগকে বলিতেছ, আনো আমরা পান করি। প্রভু পরম প্রভু আপন পবিত্রতার শপথ করিয়া বলিয়াছেন, দেখ তোমাদের উপরে এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকে তোমাদিগকে আঁকড়া দ্বারা ও তোমাদের শেষাংশকে ধীবরের বড়শি দ্বারা টানিয়া লইয়া যাইবে। আর তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন সম্মুখস্থ ভগ্নস্থান

> সামান্য বিষয়ে যে বিশ্বস্ত, বহু বিষয়েও সে বিশ্বস্ত এবং সামান্য বিষয়ে সে অসৎ বহু বিষয়েও সে অসৎ।

এখানে "সামান্য বিষয়" বলতে জাগতিক বস্তুর ধনাধ্যক্ষতাকে বোঝান হয়েছে। এই সমস্ত বস্তু যারা প্রভুর গৌরবের এবং সহ-মানবের আশীর্বাদের জন্য ব্যবহার করে, তারাই আস্থার পাত্র। যারা তাদের ধনসম্পদ নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্য, আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার জন্য ব্যবহার করে, তারাই অসৎ। কোনো মানুষকে যদি সামান্য বিষয়ে (জাগতিক বস্তু) বিশ্বাস করা না যায়, তা হলে, বড়ো বিষয়ে (আধ্যাত্মিক বস্তুর ধনাধ্যক্ষতা) তাকে কীভাবে বিশ্বাস করা যাবে? কোনো মানুষ যদি ধমসম্পদ সম্পর্কে অসৎ হয়, তা হলে খ্রীস্টের পরিচারক বা ঐশ্বরিক রহস্যের ধনাধ্যক্ষ রূপে তার কাছ থেকে কীভাবে বিশ্বস্ততা প্রত্যাশা করতে পারি (১ করিন্থীয় ৪ : ১)।

প্রভু তাই আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন ঃ

> জাগতিক ধনসম্পদ সম্বন্ধে যদি তুমি বিশ্বস্ত না হও, তা হলে প্রকৃত সম্পদ কে বিশ্বাস করে তোমার কাছে রাখবে? (১১ পদ)

জাগতিক সম্পদ প্রকৃত ঐশ্বর্য নয়। এর মূল্য ক্ষণস্থায়ী। আধ্যাত্মিক সম্পদই প্রকৃত ঐশ্বর্য। এর মূল্য অপরিমেয় এবং কখনো এর পরিসমাপ্তি ঘটবে না। কোনো মানুষকে যদি জাগতিক বিষয়ে বিশ্বাস করা না যায়, তা হলে সে আশা করতে পারে না যে, ঈশ্বর তার এই জীবনে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য দিয়ে অথবা স্বর্গের জীবনে ঐশ্বর্য দিয়ে তার উপর নির্ভর করবেন।

এর পর, এই বিষয়ে প্রভু আবার বলেছেন ঃ

> অন্যের জিনিস সম্বন্ধে তোমরা যদি বিশ্বস্ত না-হও, তবে তোমাদের নিজের জিনিসই বা তোমাদের কে দেবে? (১২ পদ)

জাগতিক সম্পদ আমাদের নিজস্ব নয়, সে সম্পদ ঈশ্বরের। ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া ধনাধ্যক্ষকতা রূপে আমরা সে সম্পদ ভোগ করছি। যে সমস্ত বিষয় আমাদের নিজস্ব বলে অভিহিত করা যেতে পারে, তা আমাদের এখানকার কঠোর অধ্যয়ন ও পরিচর্যার ফল স্বরূপ লাভ করেছি এবং সেগুলি আমাদের সেখানকার বিশ্বস্ত ধনাধ্যক্ষতার পুরস্কার। আমরা যদি ঈশ্বরের সম্পদ ব্যবহারের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি রূপে নিজেদের প্রমাণ করতে না-পারি, তা হলে, আমরা এই জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের গভীরতম সত্যে প্রবেশ করার বা পরবর্তী জীবনে পুরস্কার লাভের প্রত্যাশা করতে পারি না।

চরম গুরুত্ব আরোপ করে প্রভু এর পর সমগ্র রূপক কাহিনীর শিক্ষার সারসংক্ষেপ করেছেন ঃ

> কোনো দাস দুইজন প্রভুর সেবা করতে পারে না। হয় সে একজনকে ঘৃণা করবে এবং অন্যজনকে ভালোবাসবে, নতুবা সে একজনের অনুরক্ত থাকবে এবং অপরজনকে অবজ্ঞা করবে। (১৩ পদ)

আনুগত্য কখনোই বিভক্ত হতে পারে না। শিষ্য কখনো দুই জগতের অধিবাসী হতে পারে না। দেওয়ান বা ধনাধ্যক্ষ হয় ঈশ্বরকে ভালোবাসবে, নতুবা ভালোবাসবে ধনসম্পদকে। যদি সে ধনসম্পত্তি ভালোবাসে, সে ঘৃণা করবে ঈশ্বরকে।

মনে রাখবেন, এই শিক্ষা রচিত হয়েছে শিষ্যদের জন্য, অবিশ্বাসীদের জন্য নয়।

আকুল আকাঙ্ক্ষা

শিষ্যের যদি মানসিক সামর্থ্য না-থাকে, তবে সে মার্জনা লাভ করতে পারে। শারীরিক ক্ষমতা না-দেখাতে পারলেও সে মার্জনা পেতে পারে। কিন্তু তার যদি আকুল আকাঙ্ক্ষা না-থাকে, তবে তার অপরাধ মার্জনা পেতে পারে না। পরিত্রাতার জন্য তার হৃদয়ে যদি জ্বলন্ত আগুন না-জ্বলে, তবে সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

সর্বোপরি, খ্রীস্টানুসারীরা এমন একজনের অনুসারী যিনি বলেছিলেন, "তাঁর আবাসের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা আমাকে গ্রাস করেছে" (যোহন ২ : ১৭)। ঈশ্বর এবং তাঁর কাজের জন্য পরিত্রাতা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। দ্বিধাবিভক্ত, নিরুৎসাহ হৃদয়ের শিষ্যদের তাঁর কর্ম-রাজ্যে কোনো স্থান নেই।

প্রভু যীশু আধ্যাত্মিক চাপের মধ্যে জীবনযাপন করেছেন। তাঁর কথার মধ্যেই তার ইঙ্গিত মেলে, "আমাকে একটি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হবে, সেটি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।" তাঁর আর একটি স্মরণযোগ্য উক্তি, "যতক্ষণ দিনের আলো আছে, আমাদের তাঁরই কাজ করতে হবে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। রাত্রি আগতপ্রায়, তখন কেউ আর কাজ করতে পারে না" (যোহন ৯ : ৪)।

দীক্ষাদাতা যোহনের আকুলতাকে প্রভু তাঁর এই কথার মধ্যে দিয়ে প্রত্যয়িত করেছিলেন, "যোহন ছিলেন আলোকবর্তিকা। তিনি প্রজ্বলিত হয়ে আলো দান করেছিলেন........" (যোহন ৫ : ৩৫)।

প্রেরিত-শিষ্য পৌল ছিলেন জিলোট সম্প্রদায়ভুক্ত। কোনো একজন লেখক পৌলের জীবনের ঐকান্তিক আগ্রহকে এইভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন ঃ

> পৌল ছিলেন এমন একজন মানুষ, যিনি বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন না। জাগতিক সম্পদ বা মঙ্গল-চিন্তার প্রতি যাঁর কোনো কামনা ছিল না, জীবনের

জন্য যাঁর কোনো যত্ন বা যাঁর কোনো মৃত্যুভয় ছিল না। কোনো প্রতিপত্তি, কোনো মান-মর্যাদার আকাঙক্ষা তাঁর ছিল না। তাঁর শুধু একটিই লক্ষ্য ছিল—ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করা। খ্রীস্টের জন্য তিনি মূর্খে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁকে বলা যেতে পারে, উদ্যোগী, গোঁড়া, প্রগল্ভ বা সৃষ্টিছাড়া —পৃথিবী তাঁকে যে-নামেই অভিহিত করতে চাক না কেন। লোকেরা তাঁকে যদি বলে, ব্যবসায়ী, গৃহী, জাগতিক, বিত্তবান, জগতের লোক, জ্ঞানী, এমন-কী, সাধারণ বুদ্ধির মানুষ—সবকিছুই তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হয় তিনি প্রচার করবেন, নয়তো মৃত্যুবরণ করবেন। মৃত্যুবরণ করতে হলেও তিনি প্রচার করবেন। তাঁর কোনো বিশ্রাম ছিল না। জনপদে, সমুদ্রে, পাহাড়ে-পর্বতে, পথহীন মরুপ্রান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করেছেন, অব্যাহতি দেননি এবং প্রতিবন্ধকও হতেন না। কারাগারের মধ্যে এবং ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মাঝে তিনি উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন, তিনি নীরব থাকেননি। বিচারপরিষদ্ এবং রাজন্যবর্গের সমক্ষে তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন। মৃত্যু ছাড়া কিছুই তাঁর কণ্ঠরোধ করতে পারেনি। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে উদ্যত তরবারির নিচে মাথা পেতে দিয়েও তিনি প্রচার করেছেন, প্রার্থনা করেছেন, সাক্ষ্য দিয়েছেন, স্বীকার করেছেন, অনুনয় করেছেন, সংগ্রাম করেছেন এবং অবশেষে তিনি নিষ্ঠুর মানুষদের আশীর্বাদ জানিয়েছেন।

ঈশ্বরভক্ত অন্যান্য মানুষেরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই একই জ্বলন্ত আকাঙক্ষার স্ফুরণ দেখিয়েছেন।

সি. টি. স্টাউ এক সময় লিখেছিলেন ঃ

কেউ কেউ বাস করতে চায়,
চার্চের ঘণ্টাধ্বনির সীমানায়,
আমি চাই, এক উদ্ধারকারী দোকান চালাতে,
নরকের এক গজ দূরত্বে।

প্রসঙ্গক্রমে, এক নাস্তিকের লেখা একটি রচনার কথা উল্লেখ করি। এই রচনাটি স্টাডকে খ্রীস্টের পদতলে নিজেকে সমর্পণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রচনাটি ছিল এই রকম ঃ

লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো আমিও যদি বিশ্বাস করতাম, এই জীবনে ধর্মসম্পর্কিত জ্ঞান এবং ধর্মীয় আচরণ আমাদের শেষগতিকে প্রভাবিত করে, তবে আমার কাছে ধর্ম হত সর্ব-অর্থসমৃদ্ধ। জাগতিক আমোদ-প্রমোদকে আমি আবর্জনার মতো ছুড়ে ফেলে দিতাম। আমার কাছে জাগতিক তত্ত্বাবধান হত মুর্খামির সমতুল্য, জাগতিক চিন্তা-ভাবনা এবং অনুভূতি হত অসার। ধর্ম হত আমার প্রথম চিন্তা; নিদ্রায় অচেতন হয়ে

ঢলে পড়ার আগে হত আমার শেষ ভাবনা। শুধু এরই জন্য আমি পরিশ্রম করতাম। শুধু আগামী শেষগতির বিষয়েই আমি চিন্তা করতাম। স্বর্গের জন্য একটি আত্মাকে জয় করাকে আমি অনেক বেশি মূল্য দিতাম। জাগতিক পরিণতিকে আমি কখনো গ্রাহ্য করতাম না। আমার মুখও আমি বন্ধ করে রাখতাম না। জগৎ এবং এর আনন্দ-বেদনা আমার চিন্তায় কখনো স্থান পেত না। আমি শুধু শেষগতির দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখে সংগ্রাম করে চলতাম। জগতে বেরিয়ে পড়ে আমি অবিরত প্রচার করতাম। আমার প্রচার-বাণী হত—**সমগ্র জগৎ লাভ করেও মানুষ যদি তার নিজের আত্মাকে হারায়, তা হলে কী লাভ?**

জন্ ওয়েসলির ছিল উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। তিনি বলেছিলেন, "আমাকে এমন একশো জন মানুষ দাও, যারা সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরকে ভালোবাসে এবং পাপ ছাড়া আর কোনো কিছুকেই ভয় পায় না, তা হলে আমি সমগ্র জগৎকে নাড়িয়ে দেব।"

ইকুয়েডরের শহিদ জিম ইলিয়ট ছিলেন যীশুখ্রীস্টের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিশিখা স্বরূপ। একদিন ইব্রীয় ১ : ৭ পদে উল্লিখিত "তিনি তাঁর সেবকদের করেন অগ্নিশিখাবৎ"—শব্দগুলি পাঠ করার সময় তাঁর দিনলিপিতে লিখলেন ঃ

আমি কি প্রজ্বালনযোগ্য? ঈশ্বর আমাকে "অন্য বস্তুর" ভয়াবহ অদাহ্য থেকে মুক্ত করেছেন। আমাকে আত্মার তৈল দিয়ে সম্পৃক্ত কর—আমি যেন হতে পারি এক অগ্নিশিখা। কিন্তু শিখা ক্ষণস্থায়ী, প্রায়ই স্বল্পায়ু। হে আমার প্রাণ, তুমি কি সহ্য করতে পারবে এ কথা—স্বল্পায়ু? আমার মধ্যে সেই মহান স্বল্পায়ুর আত্মা বাস করেন, ঈশ্বরের আবাসের প্রতি আকুল আকাঙ্ক্ষা যাঁকে গ্রাস করেছিল। আমাকে কর তোমার জ্বালানি, ঈশ্বরের অগ্নিশিখা।"

শেষ ছত্রটি এমি কারমাইকেলের একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এটাই আশ্চর্যের যে, জিম ইলিয়ট এর মধ্য থেকে তাঁর অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর মণ্ডলীর জীবনে একটি মর্যাদাহানিকর ঘটনা পরিলক্ষিত হয়—কমিউনিস্ট এবং কাল্টবাদীদের চেয়ে খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জীবনে আছে আগ্রহের অভাব।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে, একজন মানুষ সতেরো জন অনুগামী নিয়ে জগৎকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। তাঁর নাম লেলিন। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছায় চল্লিশ হাজারে, এবং সেই চল্লিশ হাজার অনুগামী নিয়ে তিনি রাশিয়ার ১৬০ মিলিয়ন লোকের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হন। এই আন্দোলনের গতি তীব্রতর হয় এবং আজ পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকে তা নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের নীতি

সম্পর্কে অনেকের আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু তাদের আকুল আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

নিচের পত্রটি আমেরিকার এক মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রের লেখা। মেক্সিকোয় থাকার সময় সে কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত হয়েছিল। পত্রে সে তার প্রেমিকার কাছে তার বিবাহের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কারণ ব্যাখ্যা করেছে।

বিলি গ্রেহাম যখন প্রথম এই পত্রটি পাঠ করেন, অনেক খ্রীস্টবিশ্বাসী উপলব্ধি করেছিলেন, পত্রটি যেন তাঁদের তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করছে। পত্রটি ছিল এই রকম ঃ

> আমাদের, কমিউনিস্টদের অনেক আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আমাদের গুলিবিদ্ধ করা হয়, যথোচিত বিচার ছাড়াই আমাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আমরা কারারুদ্ধ হই, অপমাণিত হই। আমরা হই উপহাসের পাত্র। আমাদের কর্মচ্যুত করা হয়। সম্ভবপর সমস্ত উপায়ে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নেওয়া হয়। আমাদের কিছু সংখ্যক মানুষকে নিহত ও বন্দি হতে হয়। চরম দারিদ্রের মধ্যে আমাদের জীবন-যাপন করতে হয়। আমাদের জীবন ধারণের জন্য যেটুকু একান্ত প্রয়োজন, শুধু সেটুকু রেখে বাকিটা আমরা দলকে ফিরিয়ে দিই। সিনেমা দেখা বা সঙ্গীতানুষ্ঠানে যাওয়া, পান-ভোজন করা, সুন্দর সুন্দর বাড়ি বা গাড়ি কেনার জন্য আমাদের কমিউনিস্টদের অর্থব্যয় করার মতো বিলাসিতা সাজে না। আমাদের বলা হয় উন্মাদ। হ্যাঁ, আমরা উন্মাদই। পৃথিবীব্যাপী কমিউনিস্ট সংগ্রামের জন্য আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।
>
> আমাদের কমিউনিস্টদের আছে এক জীবনদর্শন, কোনো অর্থমূল্যেই যা কেনা যায় না। জীবনের এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখী হয়ে আমরা সংগ্রাম করে চলি। মানবতার এক মহান আন্দোলনের জন্য আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থকে বিসর্জন দিই। আমাদের ব্যক্তি-জীবনকে যদি কঠিন-কঠোর বলে মনে হয়, অথবা দলের বশ্যতা স্বীকারের ফলে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানবোধ যদি ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়, তা হলে আমরা এই ভেবে নিজেদের সান্ত্বনা দিই যে, মানবজাতির উদ্দেশে আমরা নতুন ও উন্নততর কিছু দান করতে পারছি। একটি বিষয়েই আমি গভীর আগ্রহ দেখিয়ে থাকি —সেটি হল কমিউনিস্ট আদর্শের বাস্তবায়ন। এই আদর্শই আমার জীবন, আমার কাজ-কর্ম, আমার ধর্ম, আমার শখ, আমার দয়িতা, আমার স্ত্রী এবং আমার প্রেমপাত্রী। এই আদর্শই আমার জীবনের খাদ্য। এই আদর্শ রূপায়নের জন্য দিনে আমি কাজ করি; রাত্রে এরই দেখি স্বপ্ন। যত দিন যায়, এর কর্তৃত্ব আমার উপর ততই কায়েম হয়, তার মাত্রা হ্রাস পায় না। তাই এই যে-শক্তি আমার জীবনকে চালিত ও নির্দেশিত করছে, তার সঙ্গে

> সম্পর্কহীন এমন কোনো বন্ধুত্ব, প্রেম-সম্পর্ক, এমন-কী, আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে পারি না। আমি জনসাধারণ, পুস্তকাবলি, আদর্শ এবং কর্ম-প্রণালীর মূল্যায়ন করি কমিউনিস্ট আদর্শ এবং তার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে। আমার মতাদর্শের কারণে ইতিমধ্যেই আমি কারাবাস করেছি, এবং প্রয়োজন হলে, সেনাবাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে দাঁড়াতেও প্রস্তুত।

কমিউনিস্টরা যদি তাদের মতাদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারে, তা হলে, খ্রীস্টবিশ্বাসীদের তাদের মহিমান্বিত প্রভুর সেবায় জীবনবলি দিতে কত বেশি আগ্রহী হওয়া উচিত! প্রভু যীশুই সবকিছু। "খ্রীস্টীয় বিশ্বাস যদি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়, তা শৌর্যময় বিশ্বাসেরই যোগ্য"—ফিগুলে।

যে-খ্রীস্টের উপর জগতের পরিত্রাণ নির্ভর করে, ঈশ্বর যদি সত্যিসত্যিই সেই খ্রীস্টে কিছু করে থাকেন, এবং তিনি যদি জ্ঞাত করেন, তা হলে যা-কিছু তাঁকে অস্বীকার করে, তাঁকে অবজ্ঞা করে, অথবা তাঁর মহিমা ক্ষুণ্ণ করে, সে সবকিছুর প্রতি খ্রীস্ট-বিশ্বাসীদের ধৈর্যশীল হওয়া কর্তব্য —জেমস ডেনি।

যে-সমস্ত মানুষ পবিত্র আত্মার নিয়ন্ত্রণে জীবনযাপন করেন, ঈশ্বর চান তাঁদেরই। অন্যরা তাঁদের সুরাসক্ত বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু যারা তাঁদের ভালোভাবে জানেন, তাঁরা উপলব্ধি করবেন যে, তাঁরা ঈশ্বরের জন্য এক গভীর, প্রবল, দুর্বার অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে ছুটে চলেছেন।

আগামী দিনের প্রত্যেক শিষ্য তার জীবনে যে উদ্দীপনার প্রয়োজন আছে, সে কথা উপলব্ধি করুক। বিশপ রাইল যে-বর্ণনা দিয়েছেন, তা বাস্তবায়িত করতে সে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক ঃ

> ধর্মে উদ্দীপ্ত ব্যক্তি প্রধানত *একটি বিষয়েই* আগ্রহী। সে আগ্রহী, আন্তরিক, আপসহীন, সর্বপথগামী, ঐকান্তিক আগ্রহশীল—এ কথা বলাই যথেষ্ট নয়। সে শুধু একটি বিষয়ই দেখে, একটি বিষয়ই গ্রাহ্য করে, একই উদ্দেশ্যের অভিমুখী হয়ে জীবনযাপন করে; শুধু একটি বিষয়ই তার জীবনের ধ্যানজ্ঞান—ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করাই হল সেই একটি বিষয়। জীবন অথবা মৃত্যু, শারীরিক সুস্থতা বা অসুস্থতা, বৈভব অথবা দারিদ্র, মানুষের সন্তুষ্টি বা বিরাগ, মানুষের কাছে জ্ঞানী কি মুর্খ, নিন্দা বা প্রশংসা, সম্মান বা লজ্জা—উদ্দীপ্ত ব্যক্তি এর কোনো কিছুই গ্রাহ্য করে না। শুধু একটি বিষয়েই সে উদ্দীপ্ত হয়—সেই একটি বিষয় হল, ঈশ্বরের সন্তোষবিধান এবং তাঁর মহিমান্বয়ন। এই উদ্দীপনার জ্বলন্ত অগ্নি যদি

তাকে গ্রাস করে, তা হলেও সে গ্রাহ্য করে না—এতেই তার পরিতৃপ্তি। সে উপলব্ধি করে, প্রদীপের মতো জ্বলবার জন্য তার জন্ম হয়েছে। জ্বলতে-জ্বলতে যদি সে নিঃশেষ হয়ে যায়, তা হলেও তার সান্ত্বনা যে, ঈশ্বর তাকে যে-কর্মে নিয়োগ করেছিলেন, সে তা সম্পন্ন করতে পেরেছে। একটি মাত্র ইচ্ছার পশ্চাতে যে-মানুষ ধেয়ে চলে, সে তার উদ্দীপনার ক্ষেত্র দেখতে পায়। সে যদি প্রচার করতে না-পারে, যদি কাজ করতে এবং অর্থদান করতে না-পারে, সে ক্রন্দন করবে, দীর্ঘশ্বাস ফেলবে এবং প্রার্থনা করবে। সে যদি কর্পদকশূন্য বা চিররুগ্ন হয়, সে অবিরত প্রার্থনার দ্বারা তার চারপাশের পাপ-চক্রকে দূরে সরিয়ে দেবে। সে যদি যিহোশূয়ের উপত্যকায় সংগ্রাম করতে না-পারে, সে পর্বতশীর্ষে মোশি, হারোণ ও হূরের দায়িত্ব পালন করবে (যাত্রাপুস্তক ১৭ : ৯-১৩)। সে যদি নিজে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, অন্য কোনো স্থান থেকে সাহায্য না-আসা এবং কর্মসমাধা না-হওয়া পর্যন্ত সে প্রভুকে বিশ্রাম করতে দেবে না। আমার কাছে 'ধর্মোন্মাদনার' অর্থ এটাই।

বিশ্বাস

জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় এবং প্রশ্নাতীত বিশ্বাস ব্যতীত প্রকৃত খ্রীস্টানুসারী হওয়া যায় না। ঈশ্বরের কাছে যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়, তাকে সর্বপ্রথম ঈশ্বরের প্রতি আস্থাশীল হতে হবে। হাডসন টেলর বলেছিলেন, "ঈশ্বরের মহান বিশ্বাসীরা দুর্বল মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বড়ো বড়ো কাজ সম্পন্ন করেছিলেন, কারণ তাঁরা জানতেন যে, ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে আছেন।"

প্রকৃত বিশ্বাস সর্বদা ঈশ্বরের কিছু প্রতিশ্রুতি, তাঁর বাক্যের অংশবিশেষের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাসী প্রথমে প্রভুর কিছু প্রতিশ্রুতি পাঠ করে বা শোনে। পবিত্র আত্মা সেই প্রতিশ্রুতিকে নিয়ে খুবই ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসীর হৃদয়ে এবং চেতনায় প্রয়োগ করেন। খ্রীস্টবিশ্বাসী বুঝতে পারে যে, ঈশ্বর সরাসরি তার অন্তরে কথা বলেছেন। প্রতিশ্রুতিদাতার উপর প্রগাঢ় আস্থায় বিশ্বাসীজন সেই প্রতিশ্রুতিকে এমনভাবে গ্রহণ করে যে, তা যেন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে—এমন-কী, মানবিকভাবে তা অসম্ভব মনে হলেও।

অথবা, প্রতিশ্রুতি না-বলে একে হয়তো আদেশই বলা যায়। বিশ্বাসের কাছে এর কোনো পার্থক্য নেই। ঈশ্বর যদি আদেশ করেন, তবে তিনি সেই আদেশকে সম্ভবপর করে তোলেন। তিনি যদি পিতরকে জলের উপর হাঁটার আদেশ দেন, পিতরের মনে নিশ্চয়তা থাকা দরকার যে, তাঁর প্রয়োজনীয় শক্তি তিনিই জোগাবেন (মথি ১৪ : ২৮)।

তিনি যদি সমস্ত সৃষ্টির কাছে আমাদের প্রচার করার আদেশ দেন, আমরা সুনিশ্চিত থাকতে পারি যে, প্রয়োজনীয় অনুগ্রহও তিনি আমাদের দান করবেন (মার্ক ১৬ : ১৫)।

সম্ভবপর বিষয়ে বিশ্বাস কাজ করে না। যে-কাজ মানবিকভাবে সম্ভবপর, সেখানে ঈশ্বরের কোনো গৌরব নেই। মানুষের ক্ষমতা যেখানে নিঃশেষিত, বিশ্বাসের শুরু সেখান থেকেই। জর্জ মুলার বলেছেন, "যেখানে সম্ভাব্যতার পরিসমাপ্তি, দৃষ্টি এবং চেতনা যেখানে ব্যর্থ, বিশ্বাসের সূচনা সেখানেই।"

বিশ্বাস বলে, "যদি 'অসম্ভব'ই একমাত্র আপত্তি হয়, তা হলে তা সম্পন্ন হতে পারে!"

"বিশ্বাস ঈশ্বরকে দৃশ্যের মধ্যে নিয়ে আসে। বিশ্বাস তাই চরম অসুবিধাজনক কিছু জানে না—হ্যাঁ, বিশ্বাস অসম্ভবকে উপহাস করে। বিশ্বাসের বিচারে, ঈশ্বরই সমস্ত প্রশ্নের শেষ উত্তর, সমস্ত বাধার শেষ সমাধান। বিশ্বাস সমস্ত বিষয়কেই ঈশ্বরে সমর্পণ করে; তাই ছয় লক্ষ কি ছয় কোটি টাকা—বিশ্বাসের কাছে তার কোনই গুরুত্ব নেই। বিশ্বাস জানে, ঈশ্বর স্বয়ংসম্পূর্ণ। ঈশ্বরের মধ্যেই সে তার সমস্ত উপায় খুঁজে পায়। অবিশ্বাস বলে, '*কেমনভাবে* এ সব বিষয় হতে পারে?' 'কেমনভাবে'—এই প্রশ্নে তা পরিপূর্ণ; কিন্তু হাজার হাজার 'কেমনভাবে' প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বাস একটি উত্তর দিয়ে থাকে, এবং সেই উত্তরটি হল, ঈশ্বর।" —সি এইচ ম্যাকিনটস।

মানবিক দৃষ্টিতে বলা যায়, অব্রাহাম এবং সারার সন্তানলাভ একটি অসম্ভব বিষয় ছিল। কিন্তু ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং ঈশ্বর মিথ্যাচার করতে পারেন—অব্রাহামের কাছে এই বিষয়টিই ছিল অসম্ভব।

> এ প্রত্যাশা তাঁর একান্ত দুরাশা হলেও তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, তিনি বহুজাতির পিতা হবেন, যেমনটি তাঁকে বলা হয়েছিল, "এরূপই হবে তোমার বংশ।" বয়স তাঁর শতবর্ষ, দেহ জরাগ্রস্ত, এবং সারা বন্ধ্যা, এ কথা জেনেও তিনি বিশ্বাসে অবিচল রইলেন। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে তিনি অবিশ্বাসী বা সন্দিহান হলেন না, বরং দৃঢ়প্রত্যয়ে তিনি ঈশ্বরকে সম্মানিত করলেন। কারণ ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা যে তিনি সফল করতে সক্ষম—এ সম্বন্ধে তিনি দৃঢ়নিশ্চিত ছিলেন। (রোমীয় ৪ : ১৮-২১)

বিশ্বাস, পরাক্রমী বিশ্বাস
প্রতিশ্রুতিকে দেখে, এবং
শুধু ঈশ্বরের দিকেই করে দৃষ্টিপাত;
বিশ্বাস বিদ্রূপ করে অসম্ভবকে;
চিৎকার করে বলে, "এ হবে নিষ্পন্ন।"

আমাদের ঈশ্বর অসম্ভবপরতায় বিশেষজ্ঞ (লুক ১ : ৩৭)। তাঁর কাছে অসাধ্য বলে কিছু নেই (আদিপুস্তক ১৮ : ১৪)। "মানুষের কাছে যা অসম্ভব, ঈশ্বরের কাছে তা সম্ভবপর" (লুক ১৮ : ২৭)।

বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির দাবি করে —"যে বিশ্বাস করে, তার কাছে সবকিছুই সম্ভবপর" (মার্ক ৯ : ২৩)। এবং পৌলের সঙ্গে উল্লাস প্রকাশ করে, "যিনি-আমাকে শক্তিদান করেন, তাঁর মাধ্যমে আমি সবকিছুই করতে পারি" (ফিলিপীয় ৪ : ১৩)।

সন্দেহ দেখে প্রতিবন্ধক—
বিশ্বাস দেখে পথ!
সন্দেহ দেখে ঘনতম রাত্রি—
বিশ্বাস দেখে দিনের আলো!
সন্দেহ ভয় পায় পদক্ষেপ নিতে—
বিশ্বাস ওঠে অতি উচ্চে,
সন্দেহ প্রশ্ন করে, "কে করে বিশ্বাস?"
বিশ্বাস উত্তর দেয়, "আমি!"

কারণ বিশ্বাসের সম্পর্ক অতিপ্রাকৃত ও ঐশ্বরিক বিষয়ের সঙ্গে —বিশ্বাসকে সব সময় "যুক্তিযুক্ত" বলে মনে হয় না। "সাধারণ জ্ঞান" ব্যবহার না-করেই অব্রাহাম যাত্রা করলেন; কোথায় যাচ্ছেন, না জেনেই যাত্রা করলেন, তিনি শুধু ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করলেন (ইব্রীয় ১১ : ৮), মারণ-অস্ত্র ছাড়াই জেরিকো আক্রমণ করে যিহোশূয় আপাতদৃষ্টিতে "চতুরতার" পরিচয় দেননি (যিহোশূয় ৬ : ১-২০)। জগতের লোকেরা এই রকম "পাগলামি"কে উপহাস করবে, কিন্তু তা কার্যকর হয়েছিল!

প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বাস খুবই যুক্তিসংগত। সৃষ্টি তার স্রষ্টাকে বিশ্বাস করবে, তার উপর আস্থা স্থাপন করবে, এর চেয়ে যুক্তিযুক্ত আর কী হতে পারে? যিনি কখনো মিথ্যা বলেন না, ব্যর্থ হন না, বা ভুল করেন না—এমন একজনকে বিশ্বাস করা কি পাগলামির পরিচয়? বরং ঈশ্বরকে বিশ্বাস করাই সবচেয়ে বিচক্ষণতাপূর্ণ, প্রকৃতিস্থ এবং যুক্তিসংগত বিষয়। এই বিশ্বাস অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া নয়। বিশ্বাস দাবি করে সুনিশ্চিত প্রমাণের এবং ঈশ্বরের অব্যর্থ বাক্যের মধ্যে সেই প্রমাণ খুঁজে পায়। কেউ কখনো বৃথাই তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করেনি; কেউ করবেও না। প্রভুকে বিশ্বাস করার মধ্যে কোনো ঝুঁকি নেই।

বিশ্বাস সত্যসত্যই ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে; যিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য—তাঁকে যথার্থ আসন দান করে। অপরপক্ষে, অবিশ্বাস ঈশ্বরকে অসম্মানিত করে। অবিশ্বাস

তাঁকে মিথ্যা দোষারোপ করে (১ যোহন ৫ : ১০)। ইস্রায়েলের পবিত্র পুরুষকে সীমায়িত করে (গীতসংহিতা ৭৮ : ৪১)।

বিশ্বাস মানুষকে তার যথার্থ স্থানও দিয়ে থাকে—মানুষ হয় নতনম্র আবেদনকারী, সর্বশক্তিমান প্রভুর কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণত।

বিশ্বাস দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়ের বিপরীত। পৌল আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা নয়, বিশ্বাসে নির্ভর করে চলি" (২ করিন্থীয় ৫ : ৭)। প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা চলার অর্থ—দৃশ্য পদ্ধতির সহায়তা লাভ করা, ভবিষ্যতের জন্য প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়া, অদৃশ্য বিপদের বিরুদ্ধে মানবিক চাতুর্য প্রয়োগ করা। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে পথচলা এর সম্পূর্ণ বিপরীত—প্রতিমুহূর্তে একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেই জীবনযাপন করতে হয়। আমাদের জৈবিক স্বভাব অদৃশ্য ঈশ্বরের উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করতে চায় না। সে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় খোঁজে। সে তার গন্তব্য যদি বুঝতে না-পারে, তার স্নায়বিক ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যাবার প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্তু বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্যতায় এগিয়ে চলে, যে-কোনো পরিস্থিতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুর সরবরাহের জন্য প্রভুর উপর আস্থা রাখে।

কোনো শিষ্য বিশ্বাস-নির্ভর জীবনযাপন করতে চাইলে, তাকে সুনিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে, তার বিশ্বাসের পরীক্ষা করা হবে। এখনই হোক, তা দু'দিন পরেই হোক—একদিন সে তার মানবিক সঙ্গতির শেষপ্রান্তে উপস্থিত হবে। তার সেই চরম দুর্দিনে প্রতিবেশীর কাছে আবেদন জানাতে প্রলুব্ধ হবে। সে যদি সত্যিসত্যিই প্রভুর উপর নির্ভর করে থাকে, তা হলে সে শুধু ঈশ্বরের দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধ করবে।

সি. এইচ. ম্যাকিনটস বলেছেন, "প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য মানুষকে নিজের প্রয়োজনের কথা জানানোর অর্থ, বিশ্বাসের জীবন থেকে বিচ্যুত হওয়া। এর দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে ঈশ্বরকেই অপমান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এ ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। ঈশ্বর আমাকে হতাশ করেছেন এবং আমি অন্য মানুষের সাহায্যপ্রার্থী হব—বলা একই কথা। এ যেন জীবনসঞ্জীবনী নির্ঝরকে পরিত্যাগ করে এক ভগ্ন জলপাত্রের অভিমুখী হওয়া। এ যেন আমার আত্মা এবং ঈশ্বরের মধ্যে সৃষ্টিকে স্থাপন করা এবং মহান আশীর্বাদ ও মহিমার ঈশ্বর থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা।"

বিশ্বাসে ক্রমবর্ধমান হওয়াই শিষ্যের স্বাভাবিক মনোভাব ও আকাঙ্ক্ষা (লুক ১৭ : ৫)। পরিত্রাণের জন্য সে ইতিমধ্যেই খ্রীস্টের উপর আস্থা স্থাপন করেছে। প্রভুর নিয়ন্ত্রণে জীবন সমর্পিত হয়েছে, সে তার সেই জীবনের পরিসীমাকে প্রসারিত করতে চায়। সে যখন অসুস্থতা, পরীক্ষা-প্রলোভন, বিয়োগান্তক ঘটনা এবং স্বজন-বিয়োগজনিত

দু:খের সম্মুখীন হয়, সে তখন নতুনভাবে ঈশ্বরকে জানতে পারে এবং তার বিশ্বাস শক্তিশালী হয়ে ওঠে। "প্রভুকে জানার জন্য যদি পথানুসরণ করি, তা হলে, তাঁকে আমরা জানতে পারব" (হোশেয় ৬ : ৩)—এই প্রতিশ্রুতির সত্যতাকে সে প্রমাণ করে। তার কাছে প্রভু যত বিশ্বাসযোগ্য রূপে প্রতিভাত হন, সে তত বেশি করে মহত্তর বিষয়ের উপর আস্থা স্থাপন করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণের মাধ্যমে হৃদয়ে বিশ্বাস উৎপাদিত হয়। তাই খ্রীস্টের শিষ্যকে সর্বদা শাস্ত্রবাক্যে সম্পৃক্ত হতে হবে—তাকে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ, অধ্যয়ন ও মুখস্থ করতে হবে এবং দিন-রাত্রি সে বিষয়ে ধ্যান করতে হবে। শাস্ত্রবাক্যই হবে তার দিকনির্ণয় যন্ত্র, কম্পাস, তার নির্দেশিকা, সান্ত্বনা এবং তার প্রদীপ ও আলোকবর্তিকা।

বিশ্বাসের জীবনে সর্বদা অগ্রগতির স্থান রয়েছে। বিশ্বাসের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যের বিষয়ে যখন আমরা পাঠ করি, আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা ছোট্ট শিশুর মতো, অসীম সমুদ্রতীরে খেলা করছি। ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে বিশ্বাসের কার্য সম্পর্কে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ৩২ - ৪০ পদে এর সমুন্নত রূপরেখা দেখতে পাই ঃ

> আর কত বলব? গিদিয়োন, বারাক, শিম্‌শোন, যিপ্তাহ্‌, দাউদ, শমূয়েল এবং নবীদের কথা বলতে গেলে সময়ের সংকুলান হবে না। এঁরা বিশ্বাসে নির্ভর করে রাজ্য জয় করেছেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন, প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ লাভ করেছেন, সিংহের মুখ বন্ধ করেছেন। লেলিহান অগ্নি নির্বাপিত করেছেন, তরবারির কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন, দুর্বলতার মাঝেই শক্তি লাভ করেছেন, যুদ্ধে বিক্রম প্রদর্শন করেছেন, বিদেশি সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করেছেন। রমণীরা তাদের মৃত সন্তানদের জীবিত ফিরে পেয়েছেন। অন্যেরা প্রহারে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, মহত্তর জীবনের আশায় মুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেউ কেউ বিদ্রূপ, কষশাঘাত, এমনকী শৃঙ্খলিত হয়ে কারাবরণ করেছেন। এঁরা প্রস্তরাঘাতে হত, করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত ও তরবারির আঘাতে নিহত হয়েছেন। নিঃস্ব ক্লিষ্ট, উৎপীড়িত অবস্থায় এঁরা মেষ ও ছাগচর্ম পরিহিত হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। এঁদের পক্ষে জগৎ উপযুক্ত স্থান ছিল না। এ পৃথিবীর পাহাড়ে, প্রান্তরে, গুহায় গহ্বরে এঁরা বিচরণ করতেন। এঁদের সকলের বিশ্বাসের কথা দৃঢ় প্রমাণিত হলেও এঁরা কিন্তু প্রতিশ্রুত ফল লাভ করেননি, কারণ ঈশ্বর আগে থেকেই আমাদের জন্য এই উত্তম ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যে আমাদের বাদ দিয়ে তাঁরা পূর্ণতা লাভ করবেন না।

একটি শেষ কথা। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, যে-শিষ্য বিশ্বাস-নির্ভর

জীবনযাপন করে, নি:সন্দেহে সে জগতের লোকের কাছে, এমনকী অন্যান্য খ্রীস্ট-বিশ্বাসীদের কাছেও স্বপ্নবিলাসী বা ধর্মোন্মাদ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এ কথা মনে রাখা ভালো যে, ''যে-বিশ্বাস কাউকে ঈশ্বরের সঙ্গে পথ চলতে সক্ষম করে, সে বিশ্বাস মানুষের চিন্তায় যথার্থ মূল্য আরোপ করতেও অক্ষম করে তোলে''—সি. এইচ. ম্যাকিনটস।

প্রার্থনা

আজ পর্যন্ত প্রার্থনা সম্পর্কে যত পুস্তক রচিত হয়েছে, একমাত্র বাইবেলের মধ্যেই তার পুরোপুরি সন্তোষজনক উত্তর মেলে। অন্য আলোচনাগুলি আমাদের মনে এই অনুভূতি জাগায় যে, আলোচনার গভীরে পৌঁছান যায়নি, অথবা তার উচ্চতা পরিমাপ করা হয়নি। এই পুস্তিকাটিতে আমরা এমন আশা করছি না যে, আমরা অন্য সকলের আলোচনাকে অতিক্রম করে যাব। আমরা শুধু একটি কাজই করতে পারি —প্রার্থনার কতকগুলি নীতিকে আমরা সন্নিবদ্ধ করতে পারি, বিশেষত, এই নীতিগুলি খ্রীস্টীয় শিষ্যত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত।

১. অন্তরের একান্ত প্রয়োজন থেকেই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনাটি উৎসারিত হয়। আমাদের সকলের জীবনেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের জীবন যখন থাকে নির্মেঘ ও অচঞ্চল, আমাদের প্রার্থনা হয় নীরস ও নাম-কা-ওয়াস্তে। যখন আমাদের জীবনে আসে সংকট, আমাদের জীবনে যখন বিপদ ঘনিয়ে আসে; যখন কোনো সাংঘাতিক পীড়া বা স্বজনবিয়োগ আসে, আমাদের প্রার্থনা তখন উষ্ণ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কোনও একজন বলেছেন, ''আকাশে তির নিক্ষেপ করতেহলে সম্পূর্ণ বাঁকানো ধনুক থেকেই তা ছুড়তে হবে।'' জরুরি মানসিকতা, অসহায়তা অথবা প্রয়োজনের চেতনা থেকেই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনাগুলি জন্ম লাভ করে।

দুর্ভাগ্যবশত, নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার কাজেই আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। সুচতুর ব্যবসায়িক পদ্ধতি দ্বারা কাল্পনিক অনিশ্চয়তার ভীতিতে স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণগুলি সংগ্রহ করি। অকৃত্রিম মানবিক চাতুর্যে আমরা এত বেশি ধন ও সম্পত্তির অধিকারী হই যে, তখন আমাদের চাইবার আর কিছুই থাকে না। তখন আমরা সবিস্ময়ে ভাবি, আমাদের প্রার্থনা-জীবন কেন এত অগভীর, এত নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে; স্বর্গ থেকে কেন আগুন নেমে আসে না! আমরা যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত না হয়ে বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হই, আমাদের প্রার্থনা-জীবন তখন বিপ্লবাত্মক হয়ে উঠবে।

২. সফল প্রার্থনার অন্যতম শর্ত —আমাদের 'অকপট হৃদয় নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে' (ইব্রীয় ১০ : ২২)। এর অর্থ, প্রভুর সাক্ষাতে আমাদের নিষ্কপট ও আন্তরিক হতে হবে। আমাদের মধ্যে কোনো রকম ভণ্ডামি থাকবে না। এই শর্ত যদি আমাদের পূরণ

করতে হয়, তা হলে আমরা এমন কোনো কাজ করতে ঈশ্বরকে অনুরোধ করব না যা আমাদের নিজেদের শক্তিতেই করতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, খ্রীস্টীয় কাজেরই জন্য আমরা ঈশ্বরকে এমন কোনো অর্থ সংগ্রহ করে দিতে কখনোই অনুরোধ করব না, যে-অর্থ আমাদের নিজের কাছেই উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না। ঈশ্বর যদি আগেই উত্তর দিয়ে থাকেন এবং আমরা তা ব্যবহার করতে ইচ্ছুক না হই, তিনি সে রকম প্রার্থনার উত্তর দেন না।

একইভাবে, আমরা নিজেরা যদি তাঁর রাজ্য বিস্তারের কাজে ব্রতী হতে চাই, তা হলে অন্যকে সেই কাজের ভার দেবার জন্য ঈশ্বরকে অনুরোধ করব না। মুসলমান, হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য হাজার হাজার প্রার্থনা উৎসর্গ করা হয়েছে। কিন্তু এই সব মানুষের কাছে খ্রীস্টের বাণী বহন করার কাজে প্রার্থনাকারীরা যদি ব্যবহৃত হতে চাইত, তা হলে, খ্রীস্টীয় মিশনের ইতিহাস হয়তো আরও উৎসাহজনক হত।

৩. প্রার্থনা হওয়া উচিত সহজ সরল, বিশ্বাসপূর্ণ এবং নির্দ্বিধ। প্রার্থনার সঙ্গে ঈশতাত্ত্বিক সমস্যা বিজড়িত হয়ে পড়া সম্ভব। এ শুধু আত্মিক চেতনাকেই ভোঁতা করে দেয়। প্রার্থনার সঙ্গে সম্পর্কিত নিগূঢ় সমস্যাগুলির সমাধান করার চেয়ে প্রার্থনায় রত থাকা বরং বেশি ভালো। ঈশতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা তত্ত্বকথা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করুন। কিন্তু সরল বিশ্বাসীরা শিশুসুলভ বিশ্বাস দিয়ে স্বর্গের দ্বারকে ঝাঁকুনি দিক। সাধু অগাস্টিন বলেছিলেন, “অশিক্ষিতরা সবলে স্বর্গ অধিকার করছে, কিন্তু আমরা আমাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে জৈব প্রকৃতির ঊর্দ্ধে উঠতে পারি না।”

আমি জানি না, কোনো অ-সাধারণ পদ্ধতি,
শুধু জানি —ঈশ্বর উত্তর দেন প্রার্থনার।
জানি না, কখন তিনি পাঠান তাঁর বাণী,
যে-বাণীতে বুঝি, আমাদের নিয়ত প্রার্থনা তিনি
শুনেছেন;
শুধু জানি, আজ বা কাল, মিলবে তাঁর উত্তর,
তাই আমাদের করতে হবে প্রার্থনা,
থাকতে হবে তাঁর প্রতীক্ষায়।
জানি না, যে-আশীর্বাদের আমি প্রত্যাশী,
তা আমারই অভিপ্রেত পথে আসবে কি না।
আমি শুধু তাঁরই কাছে করি নিবেদন,
যাঁর ইচ্ছা আমার চেয়ে অনেক বেশি বিজ্ঞতায় পূর্ণ।

—লোলা সি. হেন্‌সন

৪. প্রার্থনায় প্রকৃত শক্তির জন্য কোন বাধাই বাধা নয়। খ্রীস্টের কাছে নিজেকে সমর্পণ করুন। পরিত্রাতার অনুসারী হবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করুন। যে-ধরনের আরাধনা পরমপ্রভু খ্রীস্টকে মহিমান্বিত করে, সেই ধরনের আরাধনাই তিনি ভালোবাসেন।

৫. যে-প্রার্থনার জন্য আমাদের কিছু মূল্য দিতে হয়, সেই প্রার্থনাকেই তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। খ্রীস্ট যীশু তাঁর পিতার কাছ থেকে প্রতিদিনের নির্দেশনা লাভের জন্য প্রত্যুষে উঠে প্রার্থনা করতেন। তাঁরই মতো, যারা প্রত্যুষে উঠে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তারা খ্রীস্টের সাহচর্য লাভ করে। যারা সারারাত প্রার্থনা করার জন্য একান্ত আগ্রহী, তারা ঈশ্বরের শক্তি লাভ করে—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। যে-প্রার্থনার জন্য কোনো মূল্য দিতে হয় না। তার কোনো মূল্যই নেই, এ সস্তা দরের খ্রীস্টধর্ম থেকে উৎপন্ন একটি ফল মাত্র।

নতুন নিয়মে প্রার্থনাকে প্রায়ই উপবাসের সঙ্গে একাসনে স্থান দেওয়া হয়েছে। আত্মিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে খাদ্য-পরিহার একটি মূল্যবান সহায়ক রূপে গণ্য হতে পারে। মানবিক দিক দিয়ে বলা যায়, উপবাস স্বচ্ছতা, পবিত্রতা এবং একাগ্রতাকে বৃদ্ধি করে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে মনে হবে, আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের চেয়েও প্রার্থনাকে যখন আমরা অগ্রাধিকার দিই, প্রভু তখন বিশেষভাবে সেই প্রার্থনার উত্তর দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

৬. স্বার্থপর প্রার্থনা পরিহার করুন। "তোমরা প্রার্থনা করলেও তা পাও না। কারণ তোমরা মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করে থাক" (যাকোব ৪ :৩)। প্রভুর স্বার্থরক্ষাই হবে আমাদের প্রার্থনার প্রাথমিক লক্ষ্য। আমাদের প্রথম প্রার্থনা হবে, "তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক; তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, যেমন স্বর্গে, তেমনই এই পৃথিবীতে।" এর পর আমরা প্রার্থনা করব, "আমাদের দৈনিক আহার আজ আমাদের দাও।"

৭. ঈশ্বর মহান। তাই তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনাও হবে বড়ো বড়ো বিষয়ে এবং এইভাবেই আমরা তাঁকে সম্মানিত করতে পারি।" আমাদের মনে যেন ঈশ্বরের কাছ থেকে মহান জিনিস পাবার প্রত্যাশা থাকে।

রাজসন্নিধানে উপনীত,
মহান সানুনয় আনীত,
তাঁর প্রেম ও শক্তি এতই অপার,
তোমার আকাঙ্ক্ষা মানে পরাজয় সদা। —জন্ নিউটন

প্রভুর কাছ থেকে অল্প প্রত্যাশা করে আমরা কতবার তাঁকে দু:খ দিয়েছি। অতিসামান্য বিষয়ে জয় লাভ করেই আমরা পরিতৃপ্তি বোধ করেছি। আমাদের স্বল্প প্রাপ্তি, ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আমাদের চারপাশের মানুষদের কাছে আমাদের মহান

ঈশ্বরের মহত্ত্বকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি। মানুষের চোখে আমরা তাঁকে মহিমান্বিত করে তুলতে পারিনি। কোনো আকর্ষক চরিত্রের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরকে জানতে পারেনি বা তাদের শক্তির উৎস সম্পর্কেও অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেনি। ‘‘তাঁরা আমার মধ্যেই ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করেছে—প্রেরিত-শিষ্য সম্পর্কে যে-কথা বলা হয়, লোকে আমাদের সম্পর্কে সেকথা খুব অল্পই উচ্চারণ করেছে।’’ —ই. ডব্লিউ ম্যুর।

৮. প্রার্থনার সময়ে আমাদের সুনিশ্চিতভাবে জানতে হবে, আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা করছি কি না। এর পরেই তবে আমরা প্রার্থনা করব, এবং বিশ্বাস করব যে, তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনবেন ও তার উত্তর দেবেন। ‘‘তাঁর কাছে আমরা এই ভরসা পেয়েছি যে তাঁর ইচ্ছানুসারে আমরা যদি কিছু চাই, তা হলে তিনি আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন। আমরা যদি জানি যে, তিনি আমাদের নিবেদন শোনেন, তা হলে এ-ও জানি যে, তাঁর কাছে আমরা যা চাই, তা-ই পাই’’ (১ যোহন ৫ : ১৪, ১৫)।

প্রভু যীশুর নামে প্রার্থনা করার অর্থ, তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা করা। আমরা যখন সত্যিসত্যিই তাঁর নামে প্রার্থনা করি, এ যেন আমাদের হয়ে তিনি তাঁর পিতার কাছে মিনতি করছেন। ‘‘আমার নামের মহিমার জন্য যা কিছু তোমরা প্রার্থনা করবে, আমি তা পূর্ণ করব যেন পুত্রের মাধ্যমে পিতা মহিমান্বিত হন। আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি তোমরা কোন আবেদন জানাও, আমি তা পূর্ণ করব’’ (যোহন ১৪:১৩, ১৪।

‘‘সেদিন আমার কাছে তোমাদের আর কিছুই চাইবার থাকবে না। সত্যি সত্যিই আমি তোমাদের বলছি, আমার নামের গৌরবের জন্য তোমরা পিতার কাছে যদি কিছু প্রার্থনা কর, তিনি তা পূর্ণ করবেন’’ (যোহন ১৬ : ২৩)। ‘‘তোমাদের আরও বলছি, পৃথিবীতে তোমাদের মধ্যে দুজন যদি কোনও কোনও বিষয়ে একমত হয়ে প্রার্থনা কর, তা হলে আমার স্বর্গনিবাসী পিতা তা পূরণ করবেন। যেখানে আমার নামে দুই কিংবা তিনজন উপাসনায় মিলিত হয়, সেখানে আমি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকি’(মথি ১৮ : ১৯,২০)।

‘তাঁর নামে’ চাওয়ার অর্থ, তাঁর হাত ধরে প্রার্থনায় চালিত হওয়া। এর অর্থ, আমি বলতে পারি তিনি আমাদের পাশে নতজানু হন এবং তাঁর ইচ্ছা আমাদের অন্তরে প্রবাহিত হয়। এর অর্থই তা-ই। ‘তাঁর নামে’—তিনি যা, তাঁর প্রকৃতি যা, তাঁর নামও তা-ই। তাই খ্রীস্টের নামে প্রার্থনা করার অর্থ, তাঁর পবিত্র ইচ্ছান্‌সারে প্রার্থনা করা। ঈশ্বর-পুত্রের নামে আমি কি কোনো বিষয়ে প্রার্থনা করতে পারি? আমার প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর প্রকৃতি অভিব্যক্ত হবে। আমি কি প্রার্থনায় তাঁর প্রকৃতিকে প্রকাশ করতে পারি? প্রার্থনায় পবিত্র আত্মার শক্তি, খ্রীস্টের মনন আমাদের মধ্যে এবং আমাদের জন্য খ্রীস্টের যে-আকাঙ্ক্ষা, তা মূর্ত হয়ে উঠবে। প্রভু তাঁর নামে প্রার্থনা করার জন্য বার বার আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। ‘পরম পবিত্র আমাদের প্রভুর নামে’—এই বাক্যগুলি

উচ্চারণ না-করে আমরা প্রার্থনা শেষ করতে পারি না। তখন সেই নাম অনুসারে—যীশুর পবিত্র নামের মধ্য দিয়ে সমস্ত মিনতি প্রবিষ্ট হবে''—স্যামুয়েল রিডাট্

৯. আমাদের প্রার্থনা-জীবনকে যদি সত্যিসত্যিই ফলপ্রসূ করতে হয়, ঈশ্বরের কাছে আমাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী রাখতেই হবে। এর দ্বারা আমরা বলতে চাই, যখনই আমরা বুঝতে পারব, আমাদের হৃদয়ে পাপের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তৎক্ষণাৎ আমাদের পাপ স্বীকার করতে হবে ও তা ত্যাগ করতে হবে। ''আমার অন্তর যদি অধর্মে আসক্ত থাকত, তা হলে প্রভু শুনতেন না আমার ডাক'' (গীতসংহিতা ৬৬ : ১৮)। ''যদি তোমরা আমাকে আশ্রয় কর এবং আমার বাণী যদি তোমাদের অন্তরে বিরাজ করে, তা হলে তোমরা যা চাইবে, তা-ই তোমরা পাবে'' (যোহন ১৫ : ৭)। যে লোক খ্রীস্টের মধ্যে বসতি করে, সে তাঁর এত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকে যে, তার অন্তর প্রভুর ইচ্ছার জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকে। সে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রার্থনা করতে পারে এবং প্রার্থনার উত্তর সম্পর্কেও তার মনে নিশ্চয়তা থাকে। আবার, খ্রীস্টে সংস্থিত জীবনে আমরা তাঁর অনুজ্ঞার বাধ্য হই। ''আমরা যা চাই, তাঁর কাছ থেকে তা আমরা পাই, কারণ আমরা তাঁর সব নির্দেশ পালন করি এবং তিনি যা ভালোবাসেন, আমরা তা-ই করি'' (১ যোহন ৩ : ২২)। আমরা যদি চাই, প্রভু আমাদের প্রার্থনা শুনবেন এবং তার উত্তর দেবেন, তা হলে আমাদের আত্মার শুচিতা প্রয়োজনীয় (১ যোহন ৩ : ২০)।

১০. আমরা শুধু দিনের নির্দিষ্ট সময়গুলিতে প্রার্থনা করব না। প্রার্থনার জন্য আমাদের এমন অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যে, রাস্তায় চলতে-চলতে, গাড়ি চালাতে-চালাতে, অফিসে বা বাড়িতে কাজ করতে-করতে আমরা যেন প্রার্থনা করতে পারি। নহিমিয়ের জীবন এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত (নহিমিয় ২ : ৪খ)। বিশেষ উপলক্ষে প্রভুর সন্নিধানে আসার চেয়ে সর্বাধিপতির গোপন আশ্রয়ে বাস করা অনেক ভালো।

১১. সবশেষে, আমাদের প্রার্থনা হবে সুনির্দিষ্ট। সুনির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করলে আমরা সুনির্দিষ্ট উত্তর পাব।

প্রার্থনা আমাদের কাছে এক বিস্ময়কর সুযোগ নিয়ে আসে। এই প্রার্থনার দ্বারা, হাডসন টেলর যেমন বলেছিলেন, আমরা ঈশ্বরের মাধ্যমে মানুষকে আলোড়িত করতে শিখি।

জে. এইচ. জোয়েট বলেছেন, ''প্রার্থনার বিস্ময়কর জগতে অলৌকিক কাজ করার জন্য আমাদের হাতে কী সুযোগ রয়েছে! শীতল ও অন্ধকার স্থানে আমরা সূর্যালোক বয়ে নিয়ে যেতে পারি। হতাশার কারাগারে আমরা প্রত্যাশার আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করতে পারি। বন্দিকে আমরা শৃঙ্খলমুক্ত করতে পারি। আমরা গৃহের ঔজ্জ্বল্য ও

চিন্তা-ভাবনাকে দূরদেশে বয়ে নিয়ে যেতে পারি। সমুদ্রের পরপারে, বহু দূরবর্তী স্থানে কার্যরত আধ্যাত্মিক দুর্বল মানুষদের কাছে ঐশ্বরিক শুভেচ্ছা বয়ে নিয়ে যেতে পারি। প্রার্থনার উত্তরে অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়।”

এ বিষয়ে, ওয়েনহ্যাম নামে একজন লেখক বলেছিলেন, প্রচারশক্তি এক দুর্লভ দান, প্রার্থনা তারও চেয়ে দুর্লভ। প্রচার কাছের মানুষদের কাছে তরবারির মতো প্রয়োগ করা যায়; দূরের মানুষদের কাছে প্রচারের মাধ্যমে পৌঁছনো যায় না। প্রার্থনা দূর-পাল্লার কামানের মতো, কোনো কোনো পরিস্থিতিতে আরও বেশি কার্যকর।”

সংগ্রাম

পৃথিবীতে খ্রীস্টের কার্যক্রম বর্ণনা করতে গিয়ে সংগ্রামের যে বাক্যালঙ্কারটি বার বার ব্যবহার করা হয়েছে, তা উপলব্ধি না করে নতুন নিয়ম পাঠ করা প্রায় অসম্ভব। আধুনিক খ্রীস্টীয় রাজত্বের আমোদ-প্রামোদ থেকে প্রকৃত খ্রীস্টধর্মের আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। বিলাসী জীবনযাত্রা এবং সুখান্বেষণের সঙ্গে একে মিলিয়ে ফেললে চলবে না। বরং, প্রকৃত খ্রীস্টধর্ম মৃত্যুর উদ্দেশে সংগ্রাম, নরকের সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই। যে-শিষ্য উপলব্ধি করে না, সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে এবং পশ্চাদপসরণের কোনও অবকাশ নেই —তার কোনও মূল্য নেই।

সংগ্রামে একতা একান্ত অপরিহার্য। তখন স্বার্থপর কলহ, ঈর্ষা, বিভক্ত আনুগত্য —এ সবের সময় নয়। অন্তর্কলহে দীর্ণ কোনও গৃহ টিকে থাকতে পারে না। তাই, খ্রীস্টের সৈন্যদের একতাবদ্ধ হতে হবে। নম্রতাই সেই ঐক্যের পথ। ফিলিপীয় ২ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃত নম্র মানুষের সঙ্গে শত্রুতা বজায় রাখা একেবারেই অসম্ভব। লড়াইয়ের জন্য দুটি পক্ষের দরকার। “অহংকারই বিবাদের সুতিকাগার।” যেখানে অহংকার বা গর্ব নেই, সেখানে নেই কোনও কলহ।

সংগ্রামের সময় অনাড়ম্বর ও উৎসর্গীকৃত জীবন যাপন করা প্রয়োজন। সংগ্রামের যে-কোনও পরিণতিতেই বিভিন্ন পদ্ধতির রদবদল করা একান্ত প্রয়োজন। খ্রীস্টবিশ্বাসীদের উপলব্ধি করতে হবে, আমরা সংগ্রামে নিযুক্ত আছি এবং যথাসম্ভব ব্যয় সংকোচ করে আমাদের অর্থ সম্পদ সংগ্রামের জন্য ব্যয় করতে হবে।

রমণীমোহন নামে একজন নবীন-শিষ্য এ কথা যেমন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, অনেকেই তা পারে না। ১৯৬০ সালে, একটি খ্রীস্টীয় বিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষার্থীদের তিনি ছিলেন সভাপতি। তাঁর সময়ে প্রস্তাব করা হয়েছিল, শ্রেণির নিয়মিত আমোদ-প্রমোদ, পোশাক পরিচ্ছদ এবং শ্রেণির বরাদ্দ উপহার কেনার জন্য অর্থব্যয়

করা হবে। সুসমাচার প্রাচারের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ব্যয় বরাদ্দ না-থাকায় রমণীমোহন সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন।

তাঁর পদত্যাগের কথা যেদিন ঘোষণা করা হল, সেইদিন তাঁর সতীর্থদের মধ্যে নিম্নলিখিত পত্রটি বিতরণ করা হল ঃ

প্রিয় সতীর্থবৃন্দ,

শ্রেণির আমোদ-প্রমোদ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং উপহার ক্রয়ের বিষয়গুলি সভায় উত্থাপিত হওয়ায়, আমি শ্রেণির সভাপতি রূপে এই সমস্ত বিষয়ে খ্রীস্টিয় দৃষ্টিভঙ্গির উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করছি।

আমি মনে করি, খ্রীস্টের এবং অপরের জন্য আমরা নিজেদের জীবন, অর্থ এবং সময় দান করার মধ্য দিয়েই সবচেয়ে বেশি আনন্দ খুঁজে পাব। ''আমার জন্য যে তার প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে'' —প্রভুর এই উক্তির বাস্তবতা আমরা এইভাবেই খুঁজে পাবো।

প্রতিদিন ৭,০০০ মানুষ অনাহারে মৃত্যু বরণ করছে এবং পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষ তাদের একমাত্র প্রত্যাশার বাণী কখনও শোনেনি। যা অবিশ্বাসীদের কাছে সাক্ষ্য বহন করে না, বা ঈশ্বর-সন্তানদের ঐশ্বরিক জীবন-পথে চালিত করে না, এমন সব বিষয়ে খ্রীস্টবিশ্বাসীরা তাদের অর্থ ও সময় ব্যয় করলে, তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হবে।

সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং সমমনোভাবাপন্ন লোকদের মধ্যে নিজেদের গণ্ডিবদ্ধ না করে, বা আত্মমগ্ন সুখের জন্য সময় ও অর্থের অপচয় না করে, যারা খ্রীস্টের নাম কখনো শোনেনি, জগতের বাকি ৬০% লোকেরা কাছে, এমন-কী প্রতিবেশীর ঘরেও সুসমাচার পৌঁছে দিতে সাহায্য করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরকে আরও অনেক বেশি মহিমান্বিত করতে পারি।

সেই সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন ও সুযোগগুলিকে আমি ভালোভাবেই জানি, যেখানে যীশু খ্রীস্টের গৌরবের জন্য এবং দেশ-বিদেশের প্রতিবেশীদের সাহায্য করার জন্য অর্থব্যয় করা যায়। তাই, আমাদের নিজস্ব প্রয়োজনে শ্রেণির জন্য বরাদ্দ অর্থ অপ্রয়োজনে ব্যয় করার অনুমতি দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। যারা দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে, আমি যদি ওদেরই একজন হতাম —আমি জানি, অনেক মানুষই এই রকম অবস্থার মধ্যে রয়েছে —আমি আজ্ঞা করতাম, যাদের সামর্থ্য রয়েছে, তারা যেন আমায় সুসমাচার এবং বস্তুগত প্রয়োজন সরবরাহ করে।

''মানুষের কাছ থেকে তুমি যেমন আচরণ প্রত্যাশা কর, তার প্রতি তুমিও তেমনই আচরণ কর।''

''কিন্তু কারও যদি জাগতিক সামগ্রী থাকে এবং তার ভাইকে দুরবস্থার মধ্যে

দেখেও তার হৃদয়কে রুদ্ধ করে রাখে, তা হলে তার মধ্যে কীভাবে ঈশ্বরের ভালোবাসা থাকতে পারে?

সুতরাং ভালোবাসা ও প্রার্থনাসহ আমি বলছি, তোমরা যেন দেখতে পাও, প্রভু যীশু তার সবকিছুই দান করেছিলেন (২. করি ৮ : ৯)। আমি সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তোমাদের কাছে আমার এই পদত্যাগপত্র পাঠাচ্ছি।

খ্রীস্টাশ্রিত,
রমণীমোহন

সংগ্রামে দু:খ-যন্ত্রণা ভোগ অবশ্যম্ভাবী। আজকের যুবসমাজ দেশের জন্য যদি তাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে, তা হলে, খ্রীস্টের এবং তাঁর সুসমাচারের জন্য খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জীবন উৎসর্গ করতে আরও কত বেশি আগ্রহী হওয়া প্রয়োজন! যে-বিশ্বাসের জন্য কোনও মূল্য দিতে হয় না, তার কোনও মূল্য নেই। আমাদের কাছে প্রভু যীশুখ্রীস্টের যদি তাদের কোনও মূল্য থাকে, তা হলে আমাদের কাছে তিনিই সর্বস্ব এবং তাঁর পরিচর্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা দু:খ-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি লাভের প্রয়াস যেন আমাদের কোনক্রমেই দূরে সরিয়ে দিতে না পারে।

ক্ষুদ্রমনা সমালোচকরা যখন পৌলের প্রেরিতত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য পৌল তাঁর পারিবারিক পটভূমিকা, অথবা তাঁর শিক্ষাদীক্ষা বা তাঁর জাগতিক সাফল্যের বিষয় উল্লেখ করেননি। বরং, খ্রীস্টের জন্য তাঁর দু:খভোগের কথাই উল্লেখ করেছিলেন। “তারা যদি খ্রীস্টের সেবক হয়, আমার কথা পাগলের মতই শোনাবে, আমি মহত্তর সেবক। তাদের চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি, বেশি বার জেলে গিয়েছি, মারধোর খেয়েছি, বহু বার প্রাণ বিপন্ন করেছি। ইহুদিরা আমাকে পাঁচবার ঊনচল্লিশ ঘা চাবুক মেরেছে। তিনবার লাঠিপেটা হয়েছি, একবার পাথরের ঘায়ে ঘায়েল হয়েছি। তিনবার জাহাজডুবি হয়েছে, অকূল সমুদ্রে এক দিন ও এক রাত ভেসেছি। বহুবার যাত্রাপথে, নদীবক্ষে, দস্যুদের হাতে, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়দে হাতে, নগরে-প্রান্তরে, সমুদ্রে বন্ধুবেশী শত্রুদের জন্য বিপদে পড়েছি। সব সময় অনেক বেশি পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধন করেছি। কতদিন অনিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অনাহারে কাটিয়েছি, বস্ত্রাভাবে শীতে কত কষ্টই না সহ্য করেছি! বাইরের এ সব ঝামেলা ছাড়াও সমস্ত মণ্ডলীর জন্য ভাবনা-চিন্তা আমার মনের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে” (২ করিন্থীয় ১১ : ২৩-২৮। ভারতের বাইবেল সোসাইটি, নতুন অনুবাদ)।

পুত্রপ্রতীম তীমথিকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন “যীশুখ্রীস্টের সুযোগ্য যোদ্ধার মত অন্যদের সঙ্গে দু:খ-যন্ত্রণা ভোগ কর” (২ তীমথি ২ : ৩)।

সংগ্রামে একান্ত বাধ্যতার প্রয়োজন। একজন প্রকৃত সেনা বিনা বাক্যব্যয়ে এবং

অবিলম্বে তার উপরঅলার আদেশ পালন করবে। আমরা যদি ভাবি, এর চেয়ে কম নিয়েই খ্রীস্ট সন্তুষ্ট হবেন, তা হলে সে ভাবনা হবে অযৌক্তিক। স্রষ্টা এবং মুক্তিদাতা রূপে, তাঁর এই প্রত্যাশা করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, যারা তাঁকে সংগ্রামে অনুসরণ করে, তারা তাঁর আদেশ অবিলম্বে ও সম্পূর্ণভাবে পালন করবে।

সংগ্রামে যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োগ করার দক্ষতা প্রয়োজন। প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের বাক্য খ্রীস্টবিশ্বাসীর যুদ্ধাস্ত্র। সে অবিরত, বিশ্বাসযুক্ত প্রার্থনায় রত থাকবে। কেবল এইভাবেই সে শত্রুর দুর্গ ভূমিসাৎ করতে পারে। এর পর, আত্মার খড়্গরূপী ঈশ্বরের বাক্য প্রয়োগ করবে। সে তাকে শাস্ত্রবাক্যের অনুপ্রেরণা সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলবে। সে স্ববিরোধী শাস্ত্রবাক্যগুলিকে কাজে লাগাতে চাইবে। সে ইতিহাস, দর্শন এবং মানবিক ঐতিহ্য থেকে বিরুদ্ধ যুক্তি খাড়া করবে। কিন্তু খ্রীস্টের সৈনিক দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে থাকবে, অবিরত তার সেই অস্ত্র প্রয়োগ করে তার কার্যকারিতা প্রমাণ করবে।

খ্রীস্টীয় যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রগুলি জগতের মানুষের কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে। জেরিকোর বিরুদ্ধে যে-পরিকল্পনাটি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল, আজকের সামরিক নেতাদের মনে তা হাস্যোদ্রেক করবে। গিদিয়নের অকিঞ্চিৎকর সৈন্যসংখ্যা হাসির খোরাক জোগাবে। দাউদের ফিঙ্গা, শম্গরের গোচারণের পাঁচনি এবং শতাব্দের পর শতাব্দ ধরে ঈশ্বরের যে-মূর্খ সেনাবাহিনী কাজ করে চলেছে, সে বিষয়ে কী বলব? অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন মন জানে, ঈশ্বর বিশাল সেনাবাহিনীর পাশে থাকেন না, বরং, তিনি জগতের দুর্বল, দরিদ্র, তুচ্ছ বিষয়গুলিকে ভালোবাসেন এবং তাদের মধ্যে দিয়েই তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত করেন।

সংগ্রামে শত্রু এবং তার রণকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। খ্রীস্টীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। "কারণ আমাদের সংগ্রাম কোন রক্ত-মাংসের শরীরের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু শাসন-নীতি ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। তামসলোকের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে, অতিপ্রাকৃত জগতের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে" (ইফিসীয় ৬ : ১২)। আমরা জানি, "শয়তান নিজেও জ্যোতির্ময় স্বর্গদূতের ছদ্মবেশ ধারণ করে। সুতরাং তার অনুচরেরা যে ঈশ্বরের ধার্মিক সেবকের ছদ্মবেশ ধারণ করবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু পরিণামে তাদের কাজের প্রতিফল তারা পাবেই" (২ করি. ১১ : ১৪, ১৫)। একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত খ্রীস্টীয় সৈনিক জানে, মদ্যপ, চোর বা পণ্যনারীর কাছ থেকে তীব্র বিরোধিতা আসবে না, আসবে ধর্মের প্রখ্যাত পরিচর্যাকারীদের কাছ থেকে। ধর্মীয় নেতারাই ঈশ্বরের খ্রীস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দই আদিম মণ্ডলীর উপর অত্যাচার চালিয়েছিল। যারা ঈশ্বরের সেবক বলে নিজেদের প্রচার করত, পৌল তাদের হাতেই সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত হয়েছেন। তাই যুগ যুগ ধরে শয়তানের সেবকরা ধার্মিকতার সেবকে রূপান্তরিত হয়েছে। তাদের মুখের ভাষা ধার্মিকের মতো। তারা ধর্মীয় পোশাক পরিধান করে এবং

তারা দয়ার ভাব দেখায়। কিন্তু তাদের অন্তর খ্রীস্টের ও সুসমাচারের প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ।

সংগ্রামে অনন্যমনস্কতার প্রয়োজন। ''যে যুদ্ধরত সৈনিক তার নিয়োগকর্তা সেনাপতিকে খুশি করতে চায়, সে সাংসারিক কোন ব্যাপারে নিজেকে জড়িত করে না।'' (২ তীমথি ২ : ৪)। খ্রীস্টের শিষ্যরা জানে, তার আত্মা এবং খ্রীস্টের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের পথে যা কিছু বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাকে কেমনভাবে অগ্রাহ্য করতে হয়। অসন্তোষ প্রকাশ না-করেও সে রূঢ় হতে পারে, অসৌজন্য না-দেখিয়েও সে দৃঢ়তা দেখাতে পারে। কিন্তু তার শুধু—একমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকে। আর অন্য সবকিছুতেই তাকে সংযত হতে হবে।

সংগ্রামে বিপদের মুখে সাহসের প্রয়োজন। ''তোমরা ঈশ্বরদত্ত বর্মে সজ্জিত হও, যেন সেই দুর্দিনে প্রতিরোধ করতে পার এবং তোমাদের কর্তব্য সমাপন করার পরও স্থির থাকতে পারো। রুখে দাঁড়াও।'' (ইফিসীয় ৬ : ১৩, ১৪ক)। প্রায়ই এ কথা বলা হয়ে থাকে যে ইফিসীয় ৬ ঃ ১৩-১৮ পদে খ্রীস্টীয় সৈনিকের যে-যুদ্ধাস্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে পশ্চাদপসরণের কথা বলা হয়নি—তাই পশ্চাদপসরণের কোনো অবকাশ নেই। পশ্চাদপসরণ কেন? যিনি আমাদের ভালোবেসেছেন, তাঁর মাধ্যমে আমরা যদি অধিকতর বিজয়ী হই, ঈশ্বর আমাদের সপক্ষ হওয়ার জন্য কেউ যদি আমাদের বিরুদ্ধে সফল না-হতে পারে, লড়াই শুরু করার আগেই যদি আমরা জয়লাভের নিশ্চয়তা লাভ করে থাকি, তা হলে, পশ্চাদপসরণের কথা আমরা কীভাবে চিন্তা করতে পারি?

যদি বিজয়ীদের সঙ্গে আমি একাসনে দাঁড়াই
যদি পতিত মানুষের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাই,
তাতে কী?
শুধু ভয়সর্বস্বরাই পাপী,
লড়াইয়ের ময়দানে লড়াইটাই আসল।

জগতের উপর আধিপত্য

জগতের উপর আধিপত্য করার জন্য ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেছেন। আমরা মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে নিষ্ফল মৃত্যুবরণ করি—ঈশ্বরের তা ইচ্ছা নয়। ''অস্থায়ী প্রতিষ্ঠানে তুচ্ছ এক কর্মচারী'' হয়ে আমরা জীবন অতিবাহিত করি—তাও ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নয়।

মানুষকে নির্মাণ করার সময় প্রভু তাকে জগতের উপর আধিপত্য করার অধিকার

দিয়েছিলেন। তিনি মানুষকে মহিমা ও সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। সমস্ত বস্তুকে তিনি মানুষের পদানত করেছিলেন। তিনি মানুষকে দিয়েছিলেন মর্যাদা এবং সার্বভৌমত্ব—স্বর্গদূতদের সামান্য নিচে স্থান দিয়েছিলেন মানুষকে।

পাপে পতিত হবার পর, আদম ঈশ্বরপ্রদত্ত দিব্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হল। অবিসংবাদিত কর্তৃত্বের পরিবর্তে সে এক অনিশ্চিত অস্থির জগতে শাসন করতে লাগল।

সুসমাচারে দেখি, আমরা আবার আমাদের কর্তৃত্ব ফিরে পেতে পারি। এই কর্তৃত্ব এখন গর্জনকারী কুকুর বা বিষধর সাপের উপর নিয়ন্ত্রণ নয়—বরং এই অধিকারে আমরা অবিশ্বাসীদের উত্তরাধিকার রূপে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানকে নিজেদের অধিকার রূপে দাবি করতে পারি। জে. এইচ. জোয়েট বলেছেন, ''নৈতিক ও আত্মিক সার্বভৌমত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যই প্রকৃত সাম্রাজ্য। প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদে পবিত্র শুচিশুদ্ধ জীবনের আলোক-বিচ্ছুরণ প্রতিভাত হয়।''

প্রকৃতপক্ষে, খ্রীস্টীয় আহ্বানের এই মর্যাদার কথা আদম কখনো জানতেন না। জগতের মুক্তিযজ্ঞে আমরা ঈশ্বরের অংশীদার। ডিনস্‌ডেল টি. ইয়াং বলেছেন, ''মানুষকে প্রভুর নামে জীবনের রাজকীয়তায় অভিষিক্ত করা, নিজের উপর সার্বভৌমত্ব বিস্তার করা এবং স্বর্গরাজ্যের জন্য কাজ করা—এ-ই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব।''

বর্তমান কালে অধিকাংশ মানুষেরই জীবনের ট্রাজেডি হল, তারা মহান আহ্বানের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে না। আমরা তুচ্ছ জিনিস নিয়ে সময়ের অপচয় করি; আমরা অল্পেই পরিতৃপ্ত হই। আমরা ওড়বার পরিবর্তে বুকে হেঁটে চলি। আমরা রাজা না-হয়ে, হই দাস। দেশে দেশে খ্রীস্টের সুসমাচার ছড়িয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা অল্প লোকেরই আছে।

স্পারজন ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তাঁর পুত্রের কাছে তিনি এই প্রাণবন্ত পত্রখানি লিখেছিলেন :

ঈশ্বর যদি তোমাকে মিশনারি রূপে মনোনীত করে থাকেন, আমি চাইব না, তুমি লক্ষপতির মতো নিষ্ফল মৃত্যুবরণ কর।

তুমি মিশনারি হবার উপযুক্ত হলে, আমি চাইব না, তুমি রাজা সেজে বস।

খ্রীস্টের পক্ষে মানবাত্মাকে জয় করার মতো মর্যাদা, অন্য লোকের ভিত্তির উপর নয়, নিজের ভিত্তির উপর খ্রীস্টের রাজত্ব গড়ে তোলার মতো বিশেষ সমাদর, বহু দূরবর্তী অঞ্চলে খ্রীস্টের সুসমাচার প্রচার করা মতো সম্মান সমস্ত রাজা, সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এবং সমস্ত রাজমুকুট একত্র করলেও দিতে পারে না।''

আর একজন ব্যতিক্রম ছিলেন বিখ্যাত মিশনারি ও রাজনীতিবিদ্ জন্ মট।

প্রেসিডেন্ট কুলিজ তাঁকে জাপানের রাজদূত করে পাঠাতে চাইলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ''মাননীয় প্রেসিডেন্ট, ঈশ্বর আমাকে যেদিন থেকে তাঁর রাজদূত হবার আহ্বান জানিয়েছেন, সেদিন থেকে অন্য কোনও আহ্বান আমার কর্ণে প্রবেশ করে না।''

বিলি গ্রেহাম তৃতীয় আর এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ''স্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী দূরপ্রাচ্যের জন্য একজন মানুষের সন্ধান করছিল। তাদের প্রতিনিধি রূপে তারা এক মিশনারিকে পছন্দ করল। তারা মিশনারিকে দশ হাজার পাউণ্ড দিতে সম্মত হল, মিশনারি তা প্রত্যাখ্যান করলেন; পঁচিশ হাজার দিতে সম্মত হল, মিশনারি প্রত্যাখ্যান করলেন; পঞ্চাশ হাজার দিতে সম্মত হল, মিশনারি এবারও প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার অসুবিধা কোথায়?' তিনি বললেন, ''আপনারা যা মূল্য দিতে চাইছেন তা ঠিকই আছে, কিন্তু আপনাদের চাকরি খুবই সামান্য। ঈশ্বর আমাকে মিশনারি হবার আহ্বান জানিয়েছেন।''

খ্রীস্টবিশ্বাসীর আহ্বানই সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। এ কথা আমরা যদি উপলব্ধি করতে পারি, আমাদের জীবন এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত হবে। এর পর আমরা আর কখনোই বলব না, ''আমরা জলের মিস্ত্রী হবার জন্য আহূত'', বা ''পদার্থবিদ হবার জন্য আহূত'', অথবা ''দন্তচিকিৎসক হবার জন্য আহূত''। বরং, আমরা মনে করব, ''আমরা প্রেরিত-শিষ্য হবার জন্য আহূত''—এবং অন্য সমস্ত বিষয় আমাদের কাছে জীবনধারণের উপায়রূপে বিবেচিত হবে।

আমরা দেখব, আমরা সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য, সমস্ত জাতিকে শিষ্যে পরিণত করার জন্য এবং সারা জগতে সুসমাচার পৌঁছে দেবার জন্য আহূত হয়েছি।

আপনি বলবেন, এ এক বিশাল কর্মকাণ্ড। বিশাল অবশ্যই—কিন্তু অসম্ভব নয়। নিচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে কর্মের বিশালত্বকে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা হয়েছে :

> পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যাকে যদি আমরা কল্পনায় এক জায়গায় জড়ো করি—হাজার লোকের দল করে একটা শহরে রাখি, নিচের এই বিপরীত চিত্রটি আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাবো।
>
> শতকরা ৬০ ভাগ হবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা। অন্যান্যদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে ৯৪০ জন করে। সমস্ত শহরের মোট আয়ের ৩৫% হবে ৬০ জন আমেরিকাবাসীর; ৯৪০ জন বাকি ৬৫% ভাগ করে নেবে।
>
> শহরের ৩৬ জন আমেরিকান হবে খ্রীস্টীয় মণ্ডলীর স্বীকৃত সদস্য; এবং ২৪ জনের সঙ্গে মণ্ডলীর সম্পর্ক থাকবে না। শহরে, সামগ্রিকভাবে ২৯০ জন হবে

> স্বীকৃত খ্রীস্টান এবং ৭১০ জন এর বাইরে থাকবে। সমগ্র শহরের অন্তত ৮০% হবে কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী এবং ৩৭০ জন কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। সম্ভবত, সমস্ত শহরে ৭০ জন হবে স্বীকৃত প্রটেস্টান্ট খ্রীশ্চান।
>
> সমগ্র শহরের ৩০৩ জন হবে শ্বেতকায়; ৬৯৭ জন হবে অশ্বেতকায়। ৬০ জন আমেরিকানের গড় আয়ুষ্কাল হবে ৭০ বছর; বাকিদের গড় বয়স হবে চল্লিশের মধ্যে।
>
> শহরের মোট খাদ্য সরবরাহের ১৬% উৎপাদন করবে আমেরিকানরা। এবং মোট সরবরাহের ১$\frac{১}{২}$% ভোজন করবে ও বাকি অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে।
>
> —হ্যারি স্মিথ লেইপার

তা হলে আমাদের এই প্রজন্মে পৃথিবীতে খ্রীস্টকে কীভাবে প্রচার করা যাবে? এর উত্তর —যে-সমস্ত নরনারী সর্বান্তঃকরণে প্রভুকে এবং প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালোবাসে, তাদের দ্বারাই। চিরন্তন ভালোবাসা থেকে উৎসারিত অনুরাগ এবং আত্মোৎসর্গই কেবল সেই কাজ সম্পাদন করতে পারে। যারা খ্রীস্টের ভালোবাসায় বন্দি, তারা প্রভুর জন্য কোনো আত্মোৎসর্গকেই বড়ো বলে মনে করবে না। জাগতিক লাভের জন্য যে-কাজ তারা কোনদিনই করবে না, শুধু তাঁর প্রতি ভালোবাসার কারণে তারা সেই কাজ করবে। নিজেদের জীবনকে তারা আর কখনোই প্রিয় জ্ঞান করবে না। সুসমাচারের বার্তা না-শুনেই মানুষ যেন চিরতরে বিনাশের পথে চলে না-যায়, তারা শুধু এই উদ্দেশ্যেই জীবন অতিবাহিত করবে।

হে ক্রুশবিদ্ধ, আমাকে দাও তোমারই মতো হৃদয়!
মরণোন্মুখ মানবাত্মাকে ভালোবাসতে দাও শিক্ষা—
আমার হৃদয়কে রাখো, তোমারই একান্ত সান্নিধ্যে;
নিরুদ্দিষ্ট মানুষকে তোমারই পদপ্রান্তে আনতে—
দাও আমাকে ভালোবাসা
—অমলিন কালভেরির ভালোবাসা।

—জেমস এ স্টুয়ার্ট

ভালোবাসা উদ্দেশ্যমুখী না-হলে তার পরিণতি হবে হতাশাব্যঞ্জক। এ কোনো কাজেই আসে না। পরিচর্যা তখন অনুরণিত ঘন্টা বা ঝমঝমকারী করতালের মতো হয়ে ওঠে। কিন্তু ভালোবাসা যখন হয় ধ্রুবতারা, মানুষ যখন খ্রীস্টের প্রতি ভালোবাসায় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, পৃথিবীর কোনো শক্তি তখন সুসমাচারের অগ্রগতি রোধ করতে পারে না।

একদল শিষ্যের কথা মনে করুন, যারা খ্রীস্টের জন্যই পরিপূর্ণভাবে বিক্রীত,

খ্রীস্টের ভালোবাসায় তাড়িত, খ্রীস্টের মহান বাণীর বার্তাবহ রূপে জলে-স্থলে ভ্রমণরত, নতুন নতুন অঞ্চলে অক্লান্তভাবে এগিয়ে চলেছে, খ্রীস্ট যাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, এমন মানুষদের সন্ধান করছেন, শাশ্বতকালীন মুক্তিদাতার আরাধনাকারী হবার জন্য যারা পরস্পরকে মিনতি করছেন। খ্রীস্টকে প্রচার করার জন্য জগতের এই লোকেরা কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন?

নতুন নিয়মে জগতের লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য দুটি মূল নীতির কথা বলা হয়েছে। প্রথম—প্রকাশ্যে সুসমাচার প্রচার, দ্বিতীয়, একান্তে শিষ্য তৈরি করা।

প্রথম নীতিটি সম্পর্কে বলা যায়, প্রভু যীশু এবং তার শিষ্যরা সাধারণভাবে এই নীতি ব্যবহার করতেন। লোকেরা যেখানেই সমবেত হত, সুসমাচার প্রচার করার একটা সুযোগ সেখানেই মিলিত। এইভাবেই আমরা দেখতে পাই, হাটে-বাজারে, কারাগারে, সমাজ-ভবনে, সমুদ্র ও হ্রদের তীরে সুসমাচার প্রচারিত হত। এর জরুরি এবং পরমোৎকর্ষ চরিত্রের জন্য একটা বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ করে রাখার কথা চিন্তা করা যেত না।

ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে শিষ্য করে তোলাই খ্রীস্টীয় বিশ্বাস প্রচারের দ্বিতীয় পন্থা। যীশু তাঁর বারো জন শিষ্যকে প্রশিক্ষণ দেবার সময় এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিলেন। এই ক্ষুদ্র দলটি যেন তাঁর সঙ্গী হয় এবং তিনি যেন তাদের জগতে প্রেরণ করতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি তাদের আহ্বান করেছিলেন। দিনের পর দিন তিনি তাঁদের ঐশ্বরিক সত্যে চালিত করতেন; যে-উদ্দেশ্যে তাঁরা আহূত হয়েছেন, তাঁদের সামনে সেই লক্ষ্যকে তুলে ধরতেন। তাঁদের সম্মুখে যে-ভীতি এবং প্রতিবন্ধক পড়ে রয়েছে, সে বিষয়ে তিনি আগে থেকেই তাঁদের বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের ঈশ্বরের গূঢ় রহস্যগুলি শিক্ষা দিতেন এবং দুঃসাধ্য, অথচ মহিমময় ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তাঁদের সঙ্গী করেছিলেন। এর পর, নেকড়ে বাঘের পালের মধ্যে মেষকে প্রেরণ করার মতো তিনি তাঁদের জগতে পাঠিয়েছিলেন। পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরাক্রান্ত হয়ে তাঁরা পুনরুত্থিত, স্বর্গারোহণকারী মহিমান্বিত মুক্তিদাতাকে প্রচার করার জন্য সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এই পদ্ধতির কার্যকারিতা সপ্রমাণিত হয়েছিল—বিশ্বাসঘাতকের চাতুরিতে তাঁদের হ্রাস পেয়ে এগারো জনে পরিণত হলেও, এই ক্ষুদ্র দলটিই প্রভু যীশুখ্রীস্টের জন্য জগৎকে ওলটপালট করে দিয়েছিল।

প্রেরিতশিষ্য পৌল শুধু নিজেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেননি, তিনি তীমথিকেও সেই পথ অবলম্বন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন (২ তীমথি ২:২)। প্রথমত, সতর্কতা ও প্রার্থনার সঙ্গে বিশ্বস্ত লোকদের মনোনীত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাদের

মহান দর্শনের অংশীদার করতে হবে। তৃতীয়ত, যারা অন্যদের শিষ্যে পরিণত করতে চায়, এমন লোকদের প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা (মথি ২৮ : ১৯)।

যারা সংখ্যাধিক্য ও গরিষ্ঠ জনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, এই পদ্ধতি তাদের কাছে নীরস ও ক্লান্তিকর বলে মনে হবে, কিন্তু ঈশ্বর জানেন, তিনি কী করছেন এবং তাঁর পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। বিরাট সংখ্যক আত্মতৃপ্ত ধর্মপ্রেমীর চেয়ে স্বল্পসংখ্যক নিবেদিতপ্রাণ শিষ্যদের দ্বারা আরো অনেক বেশি ঈশ্বরের কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

এই শিষ্যরা খ্রীস্টের নামে প্রচার-অভিযানে বেরিয়ে ঈশ্বরের বাক্যে উল্লিখিত কতকগুলি মৌলিক নীতি অনুসরণ করে। প্রথমত, তারা কপোতের মতো অক্ষতিকর হলেও সাপের মতো চতুর। প্রতিকূল পথে চলতে গিয়ে তারা ঈশ্বরের কাছে বিজ্ঞতা প্রার্থনা করে। একই সঙ্গে তাদের চারপাশের পরিচিত মানুষদের সঙ্গে তারা অমায়িক ও বিনীত আচরণ করে। কেউ তাদের কাছ থেকে শারীরিক পীড়নের আশঙ্কা করে না; শুধু তাদের প্রার্থনা ও উদ্দীপক সাক্ষ্যকে ভয় করতে হবে।

এই শিষ্যরা জগতের রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। তারা কখনো মনে করে না যে, কোন সরকার বা রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তারা আহূত। যে-কোন প্রকারের সরকারের অধীনে তারা কাজ করতে পারে। যতক্ষণ না তাদের সাক্ষ্যের সঙ্গে আপস করতে হচ্ছে বা প্রভুকে অস্বীকার করতে হচ্ছে, সেই পর্যায় পর্যন্ত তারা সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। এর পর তারা ফলাফলের বাধ্য এবং অবনত হতে অস্বীকার করে। কিন্তু তারা কখনো মানুষের তৈরি সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে না বা বিপ্লবাত্মক কাজকর্মেও রত থাকে না। প্রভু কি বলেননি, "আমার রাজ্য যদি এ জগতের হত, আমার সহচররা কি সংগ্রাম করত না?" এই মানুষেরা ছিলেন এক স্বর্গীয় দেশের রাজদূত এবং এই পৃথিবীতে তাঁরা তীর্থযাত্রী এবং বিদেশি রূপে কালযাপন করে গেছেন।

তাঁদের সমস্ত আচার-আচরণে তাঁরা পুরোপুরি সততার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের কথার কখনো নড়চড় হয়নি। তাঁদের "হ্যাঁ"-এর অর্থ হ্যাঁ, "না"-য়ের অর্থ না। তারা কোন কারণেই জনপ্রিয় মিথ্যার আশ্রয় নেননি। কোন অবস্থাতেই, মঙ্গলজনক মনে হলেও, তাঁরা মন্দের সহায়তা নেননি। তাঁরা ছিলেন চেতনার মূর্তপ্রকাশ —মৃত্যুবরণ করবেন, তবু মিথ্যাচার করবেন না।

এই লোকেরা আর একটি পদ্ধতি অনুসরণ করেন। স্থানীয় মণ্ডলীর হাতে তাঁরা কাজের দায়িত্ব তুলে দেন। প্রভু যীশুর পথে মানুষকে জয় করার জন্য তাঁরা জগতের শস্যক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়েন। এরপর তাঁরা পরিবর্তিত-মনা মানুষদের স্থানীয় মণ্ডলীর সহভাগিতার পথে চালিত করেন। সেখানে তারা বিশ্বাসে পরিপক্ব হয়ে ওঠে। প্রকৃত বিশ্বাসীরা উপলব্ধি করে যে, বিশ্বাসকে প্রসারিত করার জন্য স্থানীয় মণ্ডলীই ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠান এবং এই পদ্ধতিতেই সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করা যায়।

শিষ্যরা যে-কোন ধরনেরই সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াকে পরিহার করে। কোনো মানবিক প্রতিষ্ঠান তাদের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হলে তারা কোনক্রমেই তা মেনে নেয় না। তারা শুধু স্বর্গের কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে প্রাপ্ত আদেশই পালন করে। এর অর্থ নয় যে, তারা স্থানীয় মণ্ডলীর আস্থা এবং অনুমোদন ব্যতীত কাজ করে যাবে। বরং, এই ধরনের সমর্থনকে তারা ঈশ্বরের কাজে এগিয়ে চলার অনুমোদন বলেই মনে করে। কিন্তু তারা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি অনুগত থেকে এবং তাঁর নির্দেশনা স্বীকার করে খ্রীস্টের কাজের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

সবশেষে, এই শিষ্যরা আত্মপ্রচার এড়িয়ে চলে। তারা নিজেদের সকলের অলক্ষ্যে রাখতে চায়। খ্রীস্টকে মহিমান্বিত করা এবং প্রচার করাই তাদের লক্ষ্য। তারা নিজেদের জন্য মহৎ মহৎ বিষয়ের অন্বেষণ করে না। শত্রুর কাছে তারা নিজেদের রণকৌশল প্রকাশ করে দেয় না। মানুষের নিন্দা বা প্রশংসায় ভ্রূক্ষেপ না-করে তারা নীরবে, নিরাড়ম্বরভাবে কাজ করে যায়। তারা জানে, তাদের কাজের ফলাফল জানার জন্য স্বর্গই হবে শ্রেষ্ঠ এবং নিরাপদ স্থান।

শিষ্যত্ব এবং বিবাহ

"কিছু লোক মাতৃগর্ভ থেকে নপুংসক হয়ে জন্মায়,....আবার এমনও কিছু লোক আছে যারা স্বর্গরাজ্যের জন্য স্বেচ্ছায় ক্লীবত্ব বরণ করে। এ শিক্ষা যে গ্রহণ করতে পারে, সে-ই করুক" (মথি ১৯ : ১২)।

ঈশ্বর তাঁর অনুগামীকে বিবাহিত জীবন বা অবিবাহিত জীবন যাপন করতে আহ্বান করেছেন কি না—প্রত্যেক শিষ্যকে অন্যতম এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এ একান্তভাবেই ব্যক্তিগত এবং প্রত্যেককে প্রভুর কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবেই নির্দেশনা লাভ করে থাকে। একজন আর একজনের জন্য বিধান দিতে পারে না এবং এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা খুবই বিপজ্জনক।

ঈশ্বরের বাক্য সাধারণভাবে শিক্ষা দিয়েছে যে ঈশ্বর মানবজাতির জন্য বিবাহ-প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন এবং তার পশ্চাতে ছিল কয়েকটি কারণ ঃ

১. সঙ্গীলাভ ও সুখভোগের জন্য বিবাহপ্রথা চালু হয়েছিল। ঈশ্বর দেখলেন যে, "মানুষের একাকী থাকা ভালো নয়" (আদি পুস্তক ২ : ১৮)।

২. মানবসমাজের বৃদ্ধির জন্য বিবাহের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরমপ্রভুর আদেশের মধ্যে তার নির্দেশ রয়েছে। (আদি পুস্তক ১ : ২৮)।

৩. পরিবার এবং সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এর প্রচলন। "....." (১ করিন্থীয় ৭ : ২)।

বিবাহ পবিত্র জীবন যাপন, ঈশ্বর-অনুরক্তি এবং খ্রীস্টের সেবার পরিপন্থী—বাইবেলে এমন কথা কোথাও বলা হয়নি। বরং, আমাদের বলা হয়েছে, "সকলের মধ্যে বিবাহ আদরণীয় ও সেই শয্যা হোক পবিত্র" (হিব্রীয় ১৩ : ৪ক)। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "যে স্ত্রী পায়, সে উৎকৃষ্ট বস্তু পায়" (হিতোপদেশ ১৮ : ২২)। উপদেশকের বাণী বিবাহের ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রয়োগ করা যেতে পারে, "একজনের চেয়ে দু'জন ভালো।" (উপদেশক ৪ : ৯) —বিশেষত দু'জন যদি একসঙ্গে প্রভুর কাজে নিজেদের উৎসর্গ করে। দ্বিতীয় বিবরণ ৩২ অধ্যায় ৩০ পদে সম্মিলিত কর্মের কার্যকারিতা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখি, একজন এক হাজার জনকে এবং দু'জন দশ হাজার জনকে বিতাড়িত করে।

তবুও—মানবজাতির জন্য বিবাহ-বন্ধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হলেও, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা অবশ্যপ্রয়োজনীয় নয়। বিবাহ-বন্ধনকে এক অবিচ্ছেদ্য অধিকার রূপে মনে হলেও, যীশুর শিষ্যরা এই অধিকারকে অস্বীকার করতে পারে; তা হলে, তারা আরো গভীরভাবে যীশুর সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে পারবে।

প্রভু যীশু বলেছেন, তাঁর রাজ্যে এমন মানুষ রয়েছে, যারা তাঁর কারণে নপুংসকে পরিণত হবে ঃ

"কিছু লোক মাতৃগর্ভ থেকে নপুংসক হয়ে জন্মায়,....আবার এমনও কিছু লোক আছে যারা স্বর্গরাজ্যের জন্য স্বেচ্ছায় ক্লীবত্ব বরণ করে। এ শিক্ষা যে গ্রহণ করতে পারে, সে-ই করুক" (মথি ১৯ : ১২)।

দুটি কারণে মানুষ স্বেচ্ছামূলক এই শপথ গ্রহণ করতে পারে ঃ

১. অবিবাহিত অবস্থায় থাকাই ঈশ্বরের নির্দেশ—এমন অনুভূতি লাভ করা।

২. পরিবারিক জীবনের অতিরিক্ত দায়-দায়িত্ব না নিয়ে প্রভুর কাজের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করার মানসিকতা।

সেক্ষেত্রে ঐশ্বরিক আহ্বান সম্পর্কে তার থাকবে দৃঢ়প্রত্যয় (১ করি. ৭ : ৭খ)। শুধু এর দ্বারাই খ্রীস্টশিষ্য সুনিশ্চিত হতে পারে যে, ইন্দ্রিয় দমনের জন্য প্রভু তাকে প্রয়োজনীয় আশীর্বাদ দান করবেন।

দ্বিতীয়ত, কৌমার্যবরণ হবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। কৌমার্য বাধ্যবাধকতা হলে তার মধ্যে অশুচিতা এবং ভ্রষ্টতার ভয়ঙ্কর বিপদ ওত পেতে থাকে।

প্রেরিতশিষ্য পৌল গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন যে, অবিবাহিত পুরুষ ঈশ্বরের কাজে নিজেকে আরো বেশি উৎসর্গ করতে পারে।

"...অবিবাহিত ব্যক্তি প্রভুর কাজকর্মে মনোযোগী হয়, প্রভুকে সন্তুষ্ট করাই তার

লক্ষ্য। কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি সাংসারিক বিষয়ে চিন্তা করে, কী করে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করবে, তা-ই হয় তার ভাবনা'' (১ করি. ৭ : ৩২, ৩৩)।

এই কারণে, পৌল চেয়েছেন, অবিবাহিত এবং বিধবারা যেন তাঁরই মতো অবিবাহিত অবস্থায় কাল কাটায় (১ করি. ৭ : ৭, ৮)।

এমন-কী, যারা ইতিমধ্যে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, প্রেরিত-প্রবর চেয়েছেন, সময়ের সংক্ষিপ্ততার জন্য খ্রীস্টকে প্রচার করাই হবে একমাত্র লক্ষ্য, আর সবকিছুই হবে গৌণ।

''বন্ধুগণ, আমি এ কথাই বলতে চাই যে, যুগান্তের আর বেশি বাকি নেই। এই সময় যারা বিবাহিত, তারা বিপত্নীকের মতোই জীবনযাপন করুক। যারা বিষয়কর্মে লিপ্ত তারা মনে করুক, তারা এর মধ্যে জড়িত নয়। কারণ এ জগতের আকৃতি-প্রকৃতি বিলুপ্ত হতে চলেছে'' (১ করি. ৭ : ২৯-৩১)।

এর অর্থ নয়, কোনো মানুষ তার পরিবারিক কর্তব্যে অবহেলা করবে এবং তার স্ত্রী-পুত্রকে পরিত্যাগ করে মিশনারি হয়ে বেরিয়ে পড়বে। এর অর্থ, সে পারিবারিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের উদ্দেশ্যে জীবনযাপন করবে না। খ্রীস্টকে অগ্রাধিকার না-দেবার কারণ হিসাবে সে স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির অজুহাত দেবে না।

সি. টি. স্টাড ভয় পেয়েছিলেন যে, তাঁর প্রেমিকার জীবন-মনকে তিনি এমনভাবে অধিকার করবেন যে, তাঁর প্রেমিকার জীবনে যীশু অগ্রাধিকার পাবেন না। এর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি তার জন্য একটি পঙ্‌ক্তি রচনা করে দিয়েছিলেন। এই পঙ্‌ক্তিটি সে প্রতিদিন আবৃত্তি করবে ঃ

প্রভু যীশু, আমি ভালোবাসি তোমায়,
চার্লির চেয়ে তুমি বেশি প্রিয়
আমার কাছে, আর সবকিছুই গৌণ।

কমিউনিস্টরা এক মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, সমগ্র মানবজাতির মুক্তির জন্য পারিবারিক বিষয়গুলিকে গৌণ বলে চিন্তা করতে শিখেছে। গর্ডন আরনল্ড লন্‌স্‌ডেল এর একটি উদাহরণ। ১৯৬০ সালে, রাশিয়ার গুপ্তচর হিসাবে তিনি যখন ইংল্যাণ্ডে ধরা পড়লেন, পুলিশ তাঁর কাছ থেকে তাঁর স্ত্রীর লেখা একটি পত্র ও তার ছয় পাতার একটি উত্তর অবিষ্কার করল। তাঁর স্ত্রী লিখেছে, ''জীবন কত করুণ! আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছি, তোমার কর্তব্য তুমি করে চলেছ। তোমার কাজকেই তুমি শুধু ভালোবাস। এই সমস্ত কাজ তুমি সচেতনভাবেই করে চলেছ। তা সত্ত্বেও, আমার যুক্তির মধ্যে নারীসুলভ সংকীর্ণতার পরিচয় প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু আমি যে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাভোগ করছি!

তুমি আমাকে কতটা ভালোবাস, তা আমি জানতে চাই, তা হলে আমি হয়তো মানসিক শান্তি ফিরে পাবো।''

লন্‌স্‌ডেলের উত্তরের অংশবিশেষ ঃ ''আমি শুধু এ কথাই বলতে চাই, আমার নিজের জীবন একটি মাত্র, এবং সে জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আমার জীবনের একটিই লক্ষ্য, পশ্চাদপসরণের কোনও লজ্জা যেন আমাকে স্পর্শ না করে... খুব শীঘ্রই আমি উনচল্লিশ বছরে পদার্পণ করব—জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি রইল..... ?''

পরিতাপের বিষয় তাড়াহুড়োয় বা ঈশ্বরের নির্দেশনা ছাড়াই সংঘটিত বিবাহকে শয়তান বহু সময়েই তার হাতিয়ার রূপে তুলে নেয় এবং যে-খ্রীস্টবিশ্বাসী খ্রীস্টের জন্য চূড়ান্তভাবে ব্যবহৃত হতে পারতো, শয়তানের চাতুরিতে তার পদস্খলন ঘটে। বহু আগ্রহী পথিকৃৎ তাদের বিবাহ-বেদিতেই অখণ্ড ঈশ্বরভক্তি ও সমর্পিত জীবনকে হারিয়ে ফেলেছে।

বিবাহ খ্রীস্টের ইচ্ছা পূরণের পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে। ''বিবাহ ঈশ্বরপ্রদত্ত। কিন্তু সেই বিবাহ ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠলে, তার অপব্যবহার হয়েছে বলা যায়। নারী এবং পুরুষ—অনেকের নামই উল্লেখ করা যেতে পারে—বিদেশে মিশনক্ষেত্রের জন্য ঈশ্বর তাঁদের আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু জীবন-সাথীদের বাধায় তাঁরা সেখানে কোনদিনই পৌঁছতে পারেননি। কোন কিছুই—এমন-কী, বিবাহিত জীবনের ঈশ্বর-প্রদত্ত আশীর্বাদও যেন কাউকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে প্রতিবন্ধ করে না তোলে। ....আজ কত শত মানুষ খ্রীস্টবিহীন অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছার চেয়ে ভালোবাসার মানুষের ইচ্ছাই অগ্রাধিকার পেয়েছে।''

পথিকৃৎ কর্মীদের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে সত্য—অবিবাহিত জীবনযাপনই তাঁদের ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়। শীর্ষস্থানীয় নর-নারীদের জীবনের বৈধ প্রয়োজনীয় অনেক কিছু থেকে নিজেদের বঞ্চিত করার কারণ দেখা দিতে পারে। এই ধরনের ব্যক্তি বা নারীকে হতে হবে সহনশীল, উত্তম যোদ্ধা, নির্ভার জীবনের অধিকারী এবং ভারমুক্ত সৈনিক। এ এক ঐশ্বরিক আহ্বান, বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অভিষেক।''

এই আহ্বান যারা শোনে এবং তাতে সাড়া দেয়, তারা লাভ করে প্রতিশ্রুত পুরস্কার। যীশু বলেছিলেন, '' আমি সত্যই তোমাদের বলছি, তোমরা যারা আমার অনুগামী হয়েছ নতুন যুগের শুরুতে মানবপুত্র যখন তাঁর গৌরবের সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তখন তোমরাও বারোটি সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের বারো বংশের বিচার করবে। যে-কেউ আমার জন্য বাড়ি-ঘর, ভাই-বোন, মা-বাবা, বৌ-ছেলেমেয়ে এবং জমিজমা ত্যাগ করেছে, সে তার বহুগুণ ফিরে পাবে এবং শাশ্বত জীবনের অধিকারী হবে'' (মথি ১৯ : ২৮, ২৯)।

মূল্য নিরূপণ

প্রভু যীশু তাঁর প্রতি বিশ্বাসী করে তোলার জন্য মানুষকে কখনো প্রলুব্ধ করেননি। জনপ্রিয় বাণীর দ্বারা তিনি মানুষকে আকর্ষণ করতে চাননি।

প্রকৃতপক্ষে, মানুষ যখনই তাঁর অনুগামী হতে চেয়েছে, তখনই তিনি শিষ্যত্বের কঠিনতম শর্তগুলি তাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

এই রকমই একটি ঘটনায়, আমাদের প্রভু আগামী দিনের অনুগামীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, প্রথমেই তাদের মূল্য নিরূপণ করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি একটি মিনার তৈরি করবে বলে ঠিক করে, তা হলে কাজটা শেষ করার মতো সঙ্গতি তার আছে কি না তা দেখবার জন্য প্রথমেই কি সে খরচের হিসাব করবে না? নইলে ভিত্তি স্থাপনের পর সেটি শেষ করতে না পারলে যে দেখবে, সে-ই উপহাস করে বলবে, 'এ লোকটা আরম্ভ করল, কিন্তু শেষ করতে পারল না।' অথবা কোন রাজা যুদ্ধে যাবার আগে কি ভেবে দেখবেন না যে কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে যে রাজা তাঁর বিরুদ্ধে আসছেন, দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে তিনি যুঝতে পারবেন কি না। যদি না পারেন, তা হলে অন্য রাজা দূরে থাকতেই তিনি দূত পাঠিয়ে সন্ধির শর্ত মেনে নেবেন" (লুক ১৪ : ২৮-৩২)।

এখানে খ্রীস্টীয় জীবনকে তিনি গৃহ-নির্মাণ ও যুদ্ধের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন।

গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার মতো আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে, সেই কাজে এগিয়ে যাওয়া চরম মূর্খতার শামিল। আপনার সেই অসম্পূর্ণ কাজ আপনার দূরদৃষ্টির অভাবের স্মারক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

এ কথা খুবই সত্য। কোনো এক বিশাল প্রচারসভায় আবেগতাড়িত হয়ে খ্রীস্টকে স্বীকার করা এক কথা, কিন্তু নিজেকে অস্বীকার করে ক্রুশ বহন করা ও খ্রীস্টকে অনুকরণ করা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। ক্রীশ্চান হবার জন্য মূল্য দিতে হয় না, কিন্তু সর্বদা বিশ্বাস-পূর্ণ হৃদয়ে আত্মত্যাগের পথে চলতে গেলে খ্রীস্টের জন্য দুঃখ-লাঞ্ছনাভোগ ও স্বজন-বিচ্ছেদের বেদনা ভোগ করতে হলে অনেক মূল্য দিতে হয়। খ্রীস্টীয় জীবনে ধাবন শুরু করা এক কথা, আর দিনের পর দিন, অনুকূল বা প্রতিকূল আবহাওয়ায়, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে সেই ধাবন বজায় রাখা অন্য কথা।

এক জটিল জগৎ আমাদের লক্ষ করে চলেছে। এক বিস্ময়কর সহজাত প্রবৃত্তিতে জগৎ উপলব্ধি করে যে, খ্রীস্টীয় জীবন সবকিছুরই অধিকারী, আবার কোনো কিছুরই অধিকারী নয়। জগতের লোক প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসীকে দেখে উপহাস, বিদ্রূপ এবং অবজ্ঞা করতে পারে, কিন্তু যে-মানুষটি খ্রীস্টের জন্য নিজেকেও অস্বীকার করেছে তার মনে তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার অভাব থাকে না। কিন্তু সে যখন কোন নিস্পৃহ খ্রীস্টবিশ্বাসী

দেখে, তখন তার মনে শুধু ঘৃণারই উদ্রেক হয়। জগৎ তাকে পরিহাস করে, বলে, ''এই লোকটি গৃহ নির্মাণ করতে শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ করতে পারেনি। মন-পরিবর্তনের সময় সে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু এখন সে বাকি আমাদেরই মতো। সে যাত্রা শুরু করেছিল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, কিন্তু এখন সে শ্লথগতি হয়ে পড়েছে।''

মুক্তিদাতা তাই বলেছিলেন ''তোমরা বরং মূল্য নিরূপণ করে দেখ।''

যীশু তাঁর দ্বিতীয় উদাহরণটি দিয়েছেন এক রাজার সম্পর্কে। রাজা আর একজন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই রাজা তাঁর দশ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রতিপক্ষের দ্বিগুণ সংখ্যক সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবেন কি না, প্রথমেই তাঁকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। তিনি প্রথমেই যদি যুদ্ধ ঘোষণা করে দেন এবং অন্য রাজা যখন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসছে, তখন তিনি যদি তাঁর সামরিক শক্তি পরিমাপ করতে বসেন, তা হলে তা হবে খুবই মূর্খতার পরিচয়। তাঁর তখন একটাই কাজ করার থাকবে—তাঁকে সন্ধির শ্বেত পতাকা উত্তোলন করতে হবে এবং দূত পাঠিয়ে অবনত মস্তকে শান্তির শর্ত জেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

খ্রীস্টীয় জীবনের সঙ্গে সংগ্রামকে তুলনা করলে কোনো রকম অতিশয়োক্তি করা হবে না। খ্রীস্টীয় জীবনে আছে কয়েকটি ভয়ঙ্কর শত্রু—জগৎ, জাগতিক স্বভাব এবং শয়তান। এই জীবনে আছে আশাহীনতা, রক্তাক্ত অবস্থা এবং দু:খযন্ত্রণা। সেখানে রয়েছে সুদীর্ঘ ক্লান্তিকর নিশিজাগরণ এবং দিবালোকের জন্য সুতীব্র বাসনা। সেখানে রয়েছে অশ্রুপাত, পরিশ্রম এবং পরীক্ষা। তার খ্রীস্টীয় জীবনে আছে প্রাত্যহিক মৃত্যুর অভিজ্ঞতা।

যে-মানুষ খ্রীস্টের অনুগমন করতে চায়, তাকে অবশ্যই গেথ্‌সেমানে, গব্বথা এবং গল্‌গথার কথা মনে রাখতে হবে। এবং এর পর তাকে মূল্য নিরূপণ করতেহবে। এ হয় খ্রীস্টের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, অথবা অসম্মান ও অপমানের বোঝা নিয়ে মাথা নত করা।

এই দুটি উদাহরণের সাহায্যে প্রভু যীশু তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীকেআবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি তাদের লাঞ্ছনা, দু:খ-দুর্দশারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারা যেন প্রথমেই মূল্য নিরূপণ করে নেয়।

সেই মূল্য কী? পরবর্তী পদটিতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে ঃ

"তোমাদের মধ্যে যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারবে না, সে আমার শিষ্য হতে পারবে না'' (লুক ১৪ : ৩৩)।

এর মূল্য হল ''সর্বস্ব''—মানুষের যা কিছু আছে। পরিত্রাতাকে এই সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়েছিল; যারা তাঁর অনুকরণ করবে, তাদেরও এর কম মূল্য দিলে চলবে না।

যিনি ছিলেন বর্ণনার অতীত ধনী, তিনি স্বেচ্ছায় দারিদ্র বরণ করলেন ; তাঁর শিষ্যরা কি এর চেয়ে কম মূল্য দিয়ে বিজয় মুকুট লাভ করতে পারবে?

সবশেষে, প্রভু যীশু এই বলে পরিসমাপ্তি টানলেন ঃ

"লবণ ভালো জিনিস, কিন্তু লবণ যদি তার স্বাদ হারিয়ে ফেলে, তা হলে তার সেই স্বাদ কি ফিরিয়ে আনা যায়?" (লুক ১৪ : ৩৪)।

মনে করা যেতে পারে, আজকের দিনে আমরা যে রকম লবণ ব্যবহার করি, বাইবেলের যুগে সে রকম বিশুদ্ধ লবণ ছিল না। তখনকার দিনের লবণে বহু রকমের জিনিস, যেমন বালি ইত্যাদি মেশানো থাকত; তলানি হত বিস্বাদ এবং অকেজো। মাটি অথবা সার কোনভাবেই একে কাজে লাগানো যেত না। কখনো কখনো পায়ে-চলার রাস্তা তৈরি করার কাজে একে ব্যবহার করা হত। এই ভাবেই "সেই লবণ আর কোন কাজেই আসে না। তাকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, আর লোকে তা মাড়িয়ে যায়" (মথি ৫ : ১৩)।

এই দৃষ্টান্তটির অর্থ খুবই স্বচ্ছ। খ্রীস্টীয় জীবনের একটিই মূল উদ্দেশ্য—জীবনের দ্বারা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে হবে এবং সেই জীবন সেচিত হবে খ্রীস্টের জন্যই। খ্রীস্টবিশ্বাসী পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় করে, নিজের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লালায়িত হয়ে, পৃথিবীতে সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে এবং অসার জাগতিক লাভের জন্য নিজের জীবন ও প্রতিভার অপব্যয় করে নিজের জীবনের স্বাদুভাব বিনষ্ট করতে পারে।

বিশ্বাসী যদি তার অস্তিত্বের মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যায়, তবে সে সবকিছুই হারিয়ে ফেলেছে। সে তখন কাজের উপযোগী বা শোভাবর্ধনকারী—কোনো কিছুই নয়। বিস্বাদ লবণের মতোই তার পরিণতি হয়—মানুষের পদতলে হয় দলিত।

পরিশেষে, এ কথাই বলা যায় :

যার শোনার মত কান আছে, সে শুনুক।

প্রভু যখন কখনো কোনো রূঢ়বাক্য উচ্চারণ করতে চেয়েছেন, তিনি এই কথাগুলিই প্রয়োগ করেছেন। দেখে মনে হয়, তিনি যেন জানতেনই, সমস্ত মানুষ তাঁকে গ্রহণ করবে না। তিনি জানতেন, অনেকেই তাঁর কঠিন দাবির সমালোচনা করে, তার গুরুত্বকে হ্রাস করতে চাইবে।

কিন্তু তিনি এ কথাও জানতেন, মানুষের হৃদয় উন্মুক্ত হয়ে যাবে, যুবক-বৃদ্ধ তাঁর দাবির কাছে নিজেদের অবনত করে তাঁর কাজের যোগ্য হয়ে উঠবে।

তাই তিনি দ্বার উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন, "যার শোনার মতো কান আছে, সে শুনুক।" যারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করে, তারা তাঁর অনুগামী হবার আগে মূল্য নিরূপণ করে এবং বলতে থাকে ঃ

যীশুতে চলিব মনস্থ করেছি,
যদিও একাকী, যীশুতে চলিব,
জগৎ পশ্চাতে, ক্রুশ সম্মুখে,
ফিরিব না, ফিরিব না।

শহিদের সমর্পণ

কোনো মানুষ যখন প্রকৃতই যীশুখ্রীস্টের পদতলে নিজেকে সমর্পণ করে, তার কাছে তখন জীবন-মৃত্যু সবই সমান। প্রভুকে গৌরবান্বিত করাই তখন তার একমাত্র লক্ষ্য।

একটি জনপ্রিয় পুস্তকে এই উক্তিটি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে, "আমি বাঁচি কিংবা মরি, আমার মধ্য দিয়েই খ্রীস্ট হবেন মহিমান্বিত" (ফিলিপীয় ১ : ২০)।

জিম এলিয়টের রচনাতেও এই একই উক্তির অনুরণন শোনা গেছে। কলেজে ছাত্রাবস্থাতে থাকার সময়েই তিনি দিনলিপিতে লিখেছিলেন, "আমি আউকাদের জন্য মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত।"

আর একবার তিনি লিখেছিলেন, "পিতা, ইচ্ছা হলে, আমার জীবন, আমার শোণিত তুমি গ্রহণ কর। তোমার লেলিহান অগ্নিতে তা দহন কর। আমি তা রক্ষা করব না, কারণ আমার তা রক্ষা করার কথা নয়। প্রভু যীশু, এর সবই তুমি নাও। আমার জীবনকে তুমি জগতের নৈবেদ্য রূপে সেচন কর। তোমার বেদিতে আমার শোণিত যদি প্রবাহিত হতে পারে, তবেই তো তার মূল্য।"

মনে হয় ঈশ্বরের বহু বিশ্বাস-বীর ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই একই অবস্থায় পৌঁছতে পেরেছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, "একটি গমের দানা মাটিতে পড়ে না-মরা পর্যন্ত সেটি এককই থাকে, কিন্তু মরলে পর তা হয় অজস্র ফসলদায়ী" (যোহন ১২ : ২৪)। তাঁরা সেই গমের দানা হতে ইচ্ছুক।

এই মনোভাব, প্রভু তাঁর শিষ্যদের যে-শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, "আমার জন্য যে নিজের প্রাণ হারায়, সে তা রক্ষা করবে (লুক ৯ : ২৪)

এ বিষয়ে আমরা যতই চিন্তা করব, আমাদের কাছে ততই যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে উঠবে।

প্রথমত, আমাদের জীবন কখনোই আমাদের নয়। আমাদের জন্য যিনি তাঁর অমূল্য শোণিত দান করেছেন, এ জীবন তাঁরই। যা অন্যের, তাকে আমরা স্বার্থপরতার সঙ্গে কেমনভাবে আঁকড়ে থাকব?

সি. টি. স্টাড তাঁর নিজের জন্য এই উত্তর দিয়েছেন ঃ

আমি জানতাম, যীশু আমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু আমি কোনদিনই

উপলব্ধি করিনি যে, তিনি যদি আমার জন্য মৃত্যুবরণ করে থাকেন, তা হলে, আমি আর নিজের নই। মুক্তির অর্থ, পুনরায় ক্রয় করা, যেন আমি যদি তাঁরই হই, তা হলে যা নিজের নয়, তা আঁকড়ে থেকে চোর রূপে পরিগণিত হব, অথবা ঈশ্বরের কাছে আমাকে সবকিছুই সমর্পণ করতে হবে। যখন আমি উপলব্ধি করলাম, যীশুখ্রীস্ট আমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, সেদিন তাঁর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা কষ্টকর হল না।

দ্বিতীয়ত, ইতিমধ্যে প্রভুর যদি আগমন না-ঘটে, কোন-না-কোনভাবে আমাদের মৃত্যু ঘটবে। রাজার কাজে মৃত্যু বরণ করা, অথবা দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটা —কোনটি বেশি শোচনীয় হবে? জিম এলিয়ট কি যথার্থই বলেননি, ''হারাতে পারে না, এমনকিছু লাভের জন্য কোনো ব্যক্তি যা ধরে রাখতে পারবে না, তা-ই যদি দান করে দেয়, তবে সে নির্বোধ নয়।''

তৃতীয়ত, এ উত্তর-অযোগ্য একটি যুক্তি যে, প্রভু যীশু যদি আমার জন্য মৃত্যু বরণ করে থাকেন, আমরা যে সামান্য কাজটুকু করতে পারি, তা হচ্ছে, তাঁরই জন্য মৃত্যুবরণ করা। দাস যদি তার প্রভুর চেয়ে বড়ো না হয়, তা হলে, প্রভু যীশু যে দু:খ-যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, সে পথে না-গিয়ে আমরা কীভাবে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে স্বর্গে যেতে পারি? এ জন্যই স্টাড বলেছিলেন "প্রভু যীশুখ্রীস্ট যদি ঈশ্বর হয়ে থাকেন, এবং আমার জন্য মৃত্যুবরণ করে থাকেন, তা হলে তাঁর জন্য আমার কোনো আত্মদানই মহত্তর নয়।''

সবশেষে, আমাদের আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশীদের জীবনে যদি ঈশ্বরের চিরন্তন আশীর্বাদ প্রবাহিত হতে পারে তবে সেই জীবনকে আঁকড়ে থাকা অপরাধ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে আবিষ্কারের জন্য মানুষ কখনো কখনো তাদের জীবন উৎসর্গ করে। লেলিহান আগুনের গ্রাস থেকে প্রিয়জনকে বাঁচাবার জন্য অনেকেই জীবন বিসর্জন দেয়। শত্রুর কবল থেকে দেশকে রক্ষা করতেও অনেকেই জীবন দেয়। আমাদের কাছে সেই সব মানুষের জীবনের মূল্য কতকুটু?

সকলেই যে শহিদের মৃত্যু বরণ করবে, তা নয়। আপেক্ষিকভাবে বলা যেতে পারে, জীবন্ত দগ্ধ হয়ে, বর্শাবিদ্ধ অবস্থায় অথবা গিলোটিনে মৃত্যু মনোনীত অল্প কয়েক জনের জন্যই সংরক্ষিত আছে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই শহিদের মতো উৎসাহ-উদ্দীপনা, শহিদের মতো আকুলতা এবং শহিদের মতো অনুরক্তি থাকা প্রয়োজন। যাঁরা ইতিমধ্যেই খ্রীস্টের জন্য তাঁদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদেরই মতো আমরা জীবনযাপন করতে পারি।

আসুক অসুস্থতা, আসুক সুস্থতা,
 ক্রুশ, কিংবা কিরীট;

দেখা দিক রঙধনু, কিংবা বাজুক বজ্রধ্বনি
আমার দেহ-মন হল সমর্পিত,
ঈশ্বর সেখানে করুন কর্ষণ।

প্রকৃত শিষ্যের পুরস্কার

যে-জীবন প্রভু যীশুর প্রতি সমর্পিত, সে-জীবন লাভ করে প্রভূত পুরস্কার। খ্রীস্টের অনুসরণে আছে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি এবং প্রকৃত জীবন বলতে বোঝায় এই জীবনকেই।

মুক্তিদাতা যীশু বার বার বলেছিলেন, ‘‘আমার জন্য যে জীবন হারায়, সে তা খুঁজে পাবে’’। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর অন্যান্য উক্তির তুলনায় এই উক্তিটি চারটি সুসমাচারে প্রায়ই উক্ত হয়েছে। (দেখুন—মথি ১০ : ৩৯; ১৬ : ২৫; মার্ক ৮ : ৩৫; লুক ৯ : ২৪; ১৭ : ৩৩; যোহন ১২ : ২৫)। এই উক্তিটি প্রায়ই কেন পুনরাবৃত্ত হয়েছে? কারণ, এই কথাটি খ্রীস্টীয় জীবনের মৌলিক নীতিগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। স্বার্থপর জীবন বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু যে-জীবন খ্রীস্টের জন্য উৎসর্গীকৃত, সে-জীবন ফিরে পায়, উদ্ধারলাভ করে, ভোগ করে এবং অনন্তকালের জন্য হয় রক্ষিত।

নিরুৎসাহী, উদ্দীপনাহীন খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসীরাই তাঁর শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলি ভোগ করতে পারে।

প্রকৃত শিষ্য হতে গেলে যীশু খ্রীস্টের ক্রীতদাস হতে হবে এবং সে দেখতে পাবে খ্রীস্টের সেবার মধ্যে আছে প্রকৃত স্বাধীনতা। ‘‘আমি আমার প্রভুকে ভালোবাসি; আমি মুক্তি চাই না’’—যে এ কথা বলতে পারে, প্রতি ক্ষেত্রে সে ভোগ করে স্বাধীনতা।

খ্রীস্টশিষ্য তুচ্ছ বিষয় বা ক্ষণস্থায়ী বস্তু নিয়ে মাতামাতি করে না। চিরন্তন বিষয়ের প্রতিই তার মনোযোগ এবং হাডসন টেলরের মতো কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে সম্পদ-সুখ উপভোগ করে।

অপরিচিত হলেও, সে সুপরিচিত। সে মৃতপ্রায়, অথচ জীবিত; দণ্ডিত, কিন্তু নিহত নয়। দু:খ-বেদনার মধ্যেও সে আনন্দমুখর। দরিদ্র, কিন্তু অনেককেই করছে ধনশালী। তার নিজের কিছুই নেই, তবু সর্বস্বের অধিকারী (২ করিন্থীয় ৬ : ৯,১০)।

এবং যদি এ কথা বলা যায় যে, প্রকৃত শিষ্যত্বের জীবনই জগতের সবচেয়ে আত্মিকভাবে পরিতৃপ্ত জীবন, তা হলে, সমান নিশ্চয়তার সঙ্গে এ কথাও বলা যায়, আগামী যুগে এই জীবনই হবে সবচেয়ে পুরস্কৃত জীবন।

‘‘মানবপুত্র আসবেন তাঁর পিতার মহিমায় মণ্ডিত হয়ে আপন দূতবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। তখন তিনি প্রতিটি লোককেই তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন’’ (মথি ১৬ : ২৭)।

সুতরাং সেই মানুষই বর্তমানে এবং অনন্তকালে প্রকৃত আশিসধন্য, যে বর্ডেন অভ্ ইয়েলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারে, "প্রভু যীশু, আমার জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে আমার হাত সরিয়ে নিচ্ছি। আমার হৃদয়-সিংহাসনে তোমাকে স্থাপন করছি। তুমি আমাকে পরিবর্তন কর, শুদ্ধ কর, তোমার অভিপ্রায় অনুসারে আমাকে ব্যবহার কর।"

তিনি চাননি

"কেউ বিনষ্ট হয়ে যাক, তা তিনি চাননি;
স্বর্গের মহিমায় যীশু ছিলেন বিরাজিত,
তিনি দেখলেন আমাদের নিঃস্ব পতিত জগৎকে,
আমাদের দুঃখে হলেন বিগলিত,
তাঁর আশ্চর্য প্রেমে
আমাদের জন্য নিজের জীবনকে করেন অভিসিঞ্চিত।
বিনষ্ট মানুষের সংখ্যা আমাদের চলার পথকে
করছে বন্ধুর,
অসহ্য বেদনায় হৃদয় ভারাক্রান্ত;
যীশু উদ্ধার করবেন, কিন্তু তাদের কাছে
সে বার্তা পৌঁছে দেবার কেউ নেই,
পাপ ও হতাশা থেকে উদ্ধার করার লোক নেই।

"কেউ বিনষ্ট হয়ে যাক, তা তিনি চাননি ঃ"
মানবাকারে, দুঃখ-বেদনাকে সঙ্গী করে,
তিনি এলেন তাদের করতে উদ্ধার,
দুঃখার্তকে দিতে সান্ত্বনা,
বেদনা ও লজ্জাপীড়িতদের ভগ্ন-হৃদয়কে করতে আরোগ্য।

বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে শস্যচয়নের কাল, অতিক্রান্ত,
কর্মীর সংখ্যা নগণ্য, রাত্রি সমাগত ঃ
যীশু তোমাকে ডাকছেন; শস্যচয়নে এগিয়ে এস,
তুমি লাভ করবে মানবাত্মা,
অমূল্য সে আত্মা।

সুখভোগের জন্য আছে সময়, যীশুর জন্য অল্প,
যীশুর কাজের জন্য নেই সময়,
সময় নেই—
ক্ষুধার্তকে আহার দানের,
বিনষ্ট আত্মাকে অনন্তের সুখ ফিরিয়ে দেবার।

বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে; শোন, তারা আমাদের বলছে :
তোমাদের পরিত্রাতাকে নিয়ে এস আমাদের কাছে,
তাঁর কথা বলো আমাদের!
আমরা শ্রান্ত, ভারক্লিষ্ট,
অশ্রুভারে নয়ন নিষ্প্রভ।

"কেউ বিনষ্ট হয়ে যাক, তা তিনি চাননি,"
আমি তাঁর অনুগামী, অথচ মানবাত্মাকে অধ:পতিত দেখেও
আমি স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন অতিবাহিত করতে পারি,
আমার সাহায্যের অভাবে যারা হারিয়ে গেল,
তাদের আমি কী বলব?
বিনষ্ট হয়ে যাক, এ ছিল তোমার ইচ্ছাবিরুদ্ধ;
প্রভু ক্ষমা কর, আমাদের অনুপ্রেরণা দাও, উজ্জীবিত কর।
আমাদের জাগতিকতাকে ধ্বংস কর, অনন্তের মূল্যবোধ নিয়ে
জীবন যাপন করতে তুমি আমাদের
সাহায্য কর।

—লুসি আর. মেয়ার

আপনার ধন কোথায় ?

আপনার ধন কোথায় ?

“পৃথিবীতে নিজেদের জন্য ধনসঞ্চয় কোরো না। .... স্বর্গে ধনসঞ্চয় কর; ..... কারণ যেখানে তোমার ধন, সেইখানে তোমার মনও থাকবে” (মথি ৬ : ১৯-২০)।

যেখানে ধন, সেখানেই মন। মন থাকবে টাকা জমানোর বাক্সে, অথবা স্বর্গে। কিন্তু মন বাক্স এবং স্বর্গ —উভয় স্থানেই থাকতে পারে না।

এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলেছিলেন, “খ্রীস্টবিশ্বাসী হয় সম্পত্তি ত্যাগ করবে, নয় তো সম্পত্তি আঁকড়ে থাকবে।”

প্রভু যীশু তাঁর অনুগামীদের পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, বিশ্বাসীদের হৃদয় যেন স্বর্গের জন্যই উন্মুখ থাকে।

খ্রীস্টের এই শিক্ষা আজও আমাদের কাছে মৌলিক ও পরম বলে মনে হয়। তিনি কি সত্যিসত্যিই এই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন ? আমাদের সাধারণ বুদ্ধি কি বলে না, বৃদ্ধ বয়সের জন্য আমাদের সঞ্চয় করা উচিত ? তিনি কি আশা করেন না, আমরা দুঃসময়ের জন্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করে বিচক্ষণতার পরিচয় দেব ? আমাদের প্রিয়জনদের জন্য কি অর্থের প্রয়োজন নেই ?

এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যারা খ্রীস্টের অনুগামী হতে চায়, তাদের সততার সঙ্গে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

এর উত্তর কী ? বিশ্বাসীর জীবনে অর্থ-সম্পদের স্থান সম্পর্কে বাইবেল কী শিক্ষা দেয় ? উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রয়াসের মধ্যে ভুল কোথায় ? খ্রীস্টীয় জীবনযাত্রার মান কী ?

কর্মে অধ্যবসায়

প্রথমত, আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, অর্থ-উপার্জনকে বাইবেলে নিষিদ্ধ করা হয়নি। সাধু পৌল তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবার জন্য তাঁবু নির্মাণ করতেন। (প্রেরিত ১৮ : ১-৩; ২ থেসালোনিকীয় ৩ : ৮)। থেসালোনিকীর মানুষদের তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, কেউ যদি পরিশ্রম করতে না-চায়, তবে সে যেন অনাহারেই থাকে (২ থেসা. ৩ : ১০)। বাইবেলে প্রশ্নাতীতভাবে এই সত্য তুলে ধরা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ তার নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজন মেটাবার জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে পরিশ্রম করবে।

তা হলে, এখন কি আমরা বলতে পারি, বিশ্বাসী যত ইচ্ছা অর্থ সঞ্চয়ের পশ্চাতে

ছুটে বেড়াবে? না, সে ইচ্ছা মতো অর্থ সঞ্চয় করতে পারে, কিন্তু তাকে নিচের সীমারেখাগুলি মেনে চলতে হবে ঃ

১) প্রভুর বিষয়ের উপরে তার কাজ কখনো অগ্রাধিকার পাবে না। ঈশ্বরের রাজ্য এবং তার ধার্মিকতার অনুসন্ধান করাই তার কাছে হবে প্রাথমিক কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা (মথি ৬ : ৩৩)। কাজের চাপের জন্য ঈশ্বরের উপাসনায় কখনো অবহেলা করা উচিত নয়।

২) পরিবারের প্রতি তার দায়বদ্ধতাকে সে কখনোই অবহেলা করবে না (১ তীমথি ৫ : ৮)। সাধারণভাবে মানুষ যত বেশি সময় অর্থের পিছনে ছুটে বেড়াবে, সে তার স্ত্রী এবং সন্তানদের ততো কম সময় দেবে। বিলাস এবং আড়ম্বরপূর্ণ জীবন এবং অর্থ-সম্পদ দিয়ে এর ক্ষতি পূরণ করা যায় না। এর ফলে তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের মুখে নিক্ষেপ করা হবে। মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের চেয়ে তারা চায় এক ঈশ্বরভক্ত স্বামী ও পিতার সঙ্গসুখ।

৩) তাকে সম্মানজনক কাজের মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয় করতে হবে (হিতোপদেশ ১০ : ১৬)। এ কথা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। যে-সমস্ত দ্রব্য মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক এবং নৈতিক অবনতির কারণ, কোন খ্রীস্টবিশ্বাসী সেরকম দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না, তা প্রচার করতে এবং বিজ্ঞাপনও দিতে পারে না। যে-সব মানুষ নরকের পথে ছুটে চলেছে, খ্রীস্টবিশ্বাসী তাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাতে পারে না। তার কাজ হবে সৃজনমূলক এবং সর্বসাধারণের মঙ্গলজনক।

৪) এর পর, বিশ্বাসীকে সুনিশ্চিতভাবে জানতে হবে, সে সৎপথে অর্থোপার্জন করছে (হিতোপদেশ ২০ : ১৭)। তাঁর ব্যবসায় বা কর্ম যথেষ্ট সম্মানজনক হলেও পদ্ধতি কূটকৌশলপূর্ণ হতে পারে, উদাহরণ স্বরূপ ঃ

(ক) আয়কর রিটার্ন সম্পর্কে মিথ্যাচার (হিতোপদেশ ১২ : ২২)।

(খ) ওজন ও মাপে প্রতারণা করা (হিতোপদেশ ১১ : ১)।

(গ) স্থানীয় পরিদর্শককে ঘুষ প্রদান (হিতোপদেশ ১৭ : ২৩)।

(ঘ) উৎপন্ন দ্রব্যের যেসব গুণাবলি নেই, বিজ্ঞাপনে সেই সব গুণাবলি উল্লেখ করা।

(ঙ) ব্যয়ের হিসাবপত্রে গরমিল (হিতোপদেশ ১৩ : ১৫)।

(চ) স্টক একচেঞ্জ ব্যবসা—এক ধরনের জুয়াখেলা (হিতোপদেশ ১৩ : ১১)

(ছ) কর্মচারীদের কম মজুরি দেওয়া (হিতোপদেশ ২২ : ১৬)। এর বিরুদ্ধে জাকোব বিষোদগার করেছিলেন, "তোমাদের ক্ষেতের ফসল যারা কেটেছে তাদের যে মজুরি তোমরা জোচ্চুরি করে দাওনি, তা এখন আর্তনাদ করছে। ক্ষেতমজুরদের সেই কাতর ক্রন্দন বাহিনীপতি প্রভুর কানে পৌঁচেছে" (৫ : ৪)।

৫) খ্রীস্টবিশ্বাসী নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি না-করে সাধ্যমতো অর্থোপার্জন করতে পারে। তার দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির (১ করিন্থীয় ৬ : ১৯)। অর্থের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়ে সে যেন তার স্বাস্থ্য নষ্ট না করে।

৬) সবশেষে, অর্থগৃধ্নু না হয়ে খ্রীস্টবিশ্বাসী সাধ্যমতো অর্থোপার্জন করতে পারে। সে কখনোই অর্থদেবতার দাসত্ব করবে না (মথি ৬ : ২৪)। অর্থোপার্জন দোষাবহ নয়, কিন্তু অর্থ-লালসাই দোষের (গীতসংহিতা ৬২ : ১০)।

তা হলে, সংক্ষেপে বলা যায়, খ্রীস্টবিশ্বাসী তার সাধ্য মতো অর্থোপার্জন করতে পারে, কিন্তু তাকে দিতে হবে ঈশ্বরকে অগ্রাধিকার, তাকে পারিবারিক দায়দায়িত্ব পালন করতে হবে, সৃজনধর্মিতার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে, সৎ আচরণ করতে হবে, তার স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হবে এবং অর্থলালসা ত্যাগ করতে হবে।

আছে, অথচ নেই

আমরা আর একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই ঃ ''অর্থ মজুত করা কি অন্যায়?'' যত দূর সম্ভব, নতুন নিয়মে এর বিরুদ্ধতা করা হয়নি।

ধনী হবার জন্য বাইবেলে কাউকে দোষারোপ করা হয়নি। কোনো লোক উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ লাভ করে রাতারাতি ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু আমাদের ধনসম্পত্তি আমরা কীভাবে ব্যবহার করব সে সম্পর্কে বহু আলোচনা করা যেতে পারে।

বাইবেলের শিক্ষাগুলি এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

১. প্রথমত, আমরা ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ (১ করিন্থীয় ৪ :১,২)। এর অর্থ, আমাদের যা আছে, সবই তাঁর—আমাদের নিজস্ব নয়। আমাদের দায়িত্ব, তাঁর অর্থ তাঁরই গৌরবের জন্য ব্যবহার করতে হবে। আমাদের প্রয়োজনে ৯০ শতাংশ ব্যবহার করব এবং বাকি ১০ শতাংশ প্রভুর —এই ধারণা ভুল। নতুন নিয়ম অনুসারে, ধনাধ্যক্ষের সংজ্ঞার্থ তা নয়। সমস্ত অর্থ প্রভুরই।

২. দ্বিতীয় কথা, খাদ্য এবং বস্ত্র সম্পর্কে আমাদের পরিতৃপ্ত থাকতে হবে। 'যদি আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান থাকে, তা হলে তা-ই যথেষ্ট' (১ তীমথি ৬ :৮)। আমাদের মৌলিক প্রয়োজন—খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান সম্পর্কে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বাসস্থানের ক্ষেত্রে—প্রভু আমাদের অনুমতি দিয়েছেন, এ পৃথিবীতে থাকার সময়ে যা ছিল, আমাদের থাকবে তারও বেশি। এখানে তাঁর মাথা রাখার স্থান ছিল না (মথি ৮ : ২০)।

যে খ্রীস্টবিশ্বাসী ব্যবসায় পরিচালনা করে, এ জন্য তার অবশ্যই মজুত মূলধন ও চলতি মূলধনের প্রয়োজন হবে। তাকে কাঁচা মাল কিনতে হবে, কর্মচারিদের মজুরি দিতে হবে এবং প্রতিদিন অন্যান্য অনেক দায়দায়িত্ব আছে। যে খ্রীস্টবিশ্বাসী ব্যবসা করে, ব্যবসার প্রয়োজনে তার অর্থ মজুত রাখাকে বাইবেল কখনো দোষনীয় বলে মনে করেনি।

৩. পরবর্তী পদক্ষেপ রূপে, আমরা সাধ্যমতো ব্যয়সংকোচ করব। যে-কোন রকমের অপচয়কে আমরা বর্জন করব। পাঁচ হাজার লোককে ভোজন করাবার পর অবশিষ্ট রুটির খণ্ডাংশগুলি যীশু সংগ্রহ করতে বলেছিলেন (যোহন ৬ : ১২)। তাঁর এই দৃষ্টান্তটি আমাদের শিক্ষা দেয়, আমরা যেন সম্ভব মতো সংরক্ষণ করি।

আমরা বহু অপ্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করি, বিশেষত, বড়োদিনের সময় আমরা এমন সব উপহার কিনে অপচয় করি, যে-উপহার ঘরের কোণে বা ভাঁড়ারে অনাদরে পড়ে থাকবে।

সস্তা দরের যে-জিনিসে আমাদের কাজ চলে যায়, বহু সময়েই আমরা সে রকম জিনিস না ক্রয় করে মূল্যবান দ্রব্য ক্রয় করি (সস্তা দরের জিনিস কেনাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক—এমন কথা বলছি না, জিনিসটির ওজন, গুণ ইত্যাদি আমাদের বিচার করতে হবে।)

আমাদের চাহিদা মতো সবকিছু কেনার প্রলোভন আমাদের জয় করতে হবে। মানব-পুত্রের কারণে আমাদের মিতব্যয়িতার জীবন যাপন করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৪. আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছুই প্রভুর কাজের জন্য উৎসর্গ করতে হবে (১ তীমথি ৬ : ৮)। মনে রাখবেন, তিনিই সব কিছুর মালিক। আমরা তাঁর ধনসম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে পৃথিবীতে তাঁর কাজের অগ্রগতি সাধন করাই আমাদের কাজ।

এখনই আপত্তি উঠতে পারে যে, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের অতিরিক্ত আর সবকিছুই যদি প্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করি, তা হবে মূর্খামি, অবিচক্ষণতা এবং অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

এই প্রসঙ্গে আমরা একজনের কথা উল্লেখ করতে পারি। সে ছিল বিধবা এবং সে তার দুটি পয়সা মন্দিরের কোষাগারে দান করেছিল। যীশু তাকে ভর্ৎসনা করলেন না। তিনি বললেন, "আমি তোমাদের বলছি, এই গরিব বিধবাটি সকলের চেয়ে বেশি দান করল। কারণ ওরা সকলে নিজেদের প্রচুর সম্পদ থেকে কিছু অংশ দান করেছে, কিন্তু এই নারী অভাব সত্ত্বেও তার যা কিছু সম্বল ছিল, তার সবটাই দান করল (লুক ২১ : ৩-৪)।

৫. পৃথিবীতে আমাদের ধন সঞ্চয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। শাস্ত্র বাক্যের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

"এই পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় কোরো না। এখানে পোকায় কাটে, মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যায়। চোরে সিঁদ কেটে চুরি করে। তোমরা বরং স্বর্গেই নিজেদের জন্য ধনসম্পদ সঞ্চয় কোরো। সেখানে পোকাও কাটে না, মরচেও ধরে না, আর চোরেও সিঁদ কেটে চুরি করতে পারে না। যেখানে তোমার ধন রয়েছে, সেখানে তোমার মনও থাকবে" (মথি ৬ : ১৯-২১)।

আমরা অনেকেই মনে করি, বাইবেলে এই পদগুলি না-থাকলেই ভালো হত। আমরা বিশ্বাস করি, এই কথাগুলি বলেছিলেন যীশু। আমরা বিশ্বাস করি, কথাগুলি ঐশ্বরিক প্রেরণায় উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি না যে, কথাগুলিকে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। আমরা এর বাধ্য হই না। এবং আমরা মনে করি, এই কথাগুলি যীশু যেন আদৌ কখনো বলেননি।

তবু এই সত্য আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় করা *পাপ*। এ ঐশ্বরিক বাক্যের বিরোধী। আমরা যাকে বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি বলি, প্রকৃতপক্ষে তা ঈশ্বরদ্রোহিতা এবং অপরাধ।

এবং এটা এখনো সত্য যে, যেখানে আমাদের ধন, সেখানে আমাদের মনও থাকবে। ড. জনসন একবার এক বিলাসবহুল প্রাসাদে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি প্রাসাদ এবং সুন্দরভাবে রক্ষিত উদ্যানগুলিতে ভ্রমণ করতে-করতে তাঁর বন্ধুর দিকে ঘুরে বললেন, "এই জিনিসগুলিই আমাদের মৃত্যুকালে কষ্ট দেয়।"

৬. সবশেষে, ভবিষ্যতের জন্য আমাদের ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হবে। ঈশ্বর তাঁর প্রিয়জনদের বিশ্বাসের পথে চলবার জন্য আহ্বান করেছেন। আমরা যেন তাঁরই উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতে পারি। "আমাদের প্রতিদিনের সংস্থান আজ আমাদের দাও" (মথি ৬ : ১১)। মান্নার কাহিনী প্রসঙ্গে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, প্রতিদিনের খাদ্যের সংস্থানের জন্য আমরা যেন তাঁরই দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করি (যাত্রাপুস্তক ১৬ : ১৪-২২)।

ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের নিরাপত্তা; এই জগতের জন্য কিছুর দিকে যেন আমরা ঝুঁকে না পড়ি।

তা হলে, এখন তাঁর প্রিয়জনদের জন্য প্রভুর ইচ্ছা এই—আমরা যেন উপলব্ধি করি, আমরা শুধুই ধনাধ্যক্ষ এবং আমাদের যা কিছু আছে, সবই তাঁর, জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিয়ে আমরা যেন পরিতৃপ্ত থাকি। আমরা সাধ্যমতো মিতব্যয়ী হয়ে জীবনযাপন করব; আমাদের সমস্ত প্রয়োজনের চেয়ে প্রভুর কাজকেই অগ্রাধিকার

দেব; আমরা পৃথিবীতে ধনসঞ্চয় করব না এবং ভবিষ্যতের জন্য আমরা তাঁরই উপর নির্ভর করব।

এর মধ্যে ক্ষতি কী আছে?

কিন্তু খ্রীস্টবিশ্বাসী ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করলে ক্ষতি কী?

১. সর্বপ্রথম, ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করা ভুল পদ্ধতি, কারণ বাইবেল এই রকমই বলেছে (মথি ৬ : ১৯)। এটাই সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে যথেষ্ট কারণ রূপে গণ্য হওয়া উচিত। শুভাশুভ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন করে আদম-হবা অপরাধ করেছিল কেন? কারণ, ঈশ্বর সেই রকমই বলেছিলেন। প্রত্যেকটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত এইভাবেই নিতে হবে।

২. কিন্তু এ অপরাধও, কারণ সঞ্চয়স্পৃহা আজকের জগতের চরম আধ্যাত্মিক প্রয়োজনকে অবহেলা করে (হিতোপদেশ ২৪ : ১১, ১২)। লক্ষ লক্ষ নর-নারী, বালক-বালিকা একবারের জন্যও ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচার শ্রবণ করেনি। লক্ষ লক্ষ মানুষের হাতে বাইবেল বা সুসমাচার-সাহিত্য নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঈশ্বরবিহীন, খ্রীস্টবিহীন অবস্থায় হতাশার মাঝে মৃত্যুমুখী।

সুসমাচার প্রচারের পদ্ধতি জানা সত্ত্বেও, সেই সব উপকরণগুলিকে ব্যবহার না-করা ভ্রাতৃহত্যার সমান অপরাধ (যিহিষ্কেল ৩৩ : ৬)।

ধনসম্পদ মজুত করার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মজুতদারের অন্তরে ঈশ্বরের ভালোবাসার অভাব রয়েছে। কারণ "যদি কারও ধনসম্পদ থাকে এবং অভাবগ্রস্ত কোন ভাইকে দেখেও যদি তার হৃদয় মমতা না হয়, তা হলে তার অন্তরে ঈশ্বর-প্রেমের স্থান কোথায়?" (১ যোহন ৩ : ১৭)।

পুরাতন নিয়মে দুটি কুষ্ঠরোগীর কাহিনী দেখতে পাই, অনাহারে থাকা অবস্থায় তারা অফুরন্ত খাদ্যের সন্ধান পেয়ে নিজেদের উদরপূর্তি করেছিল। কিন্তু এর পরেই তারা সেই খাদ্যের ভাগ অন্যদেরও দেবার জন্য শহরে ছুটে গিয়েছিল (২ রাজাবলি ৭ : ৯)। খ্রীস্টবিশ্বাসীরা অনুগ্রহের অধীন হয়েও বিধানের অধীনস্থ কুষ্ঠরোগীদের চেয়েও কি কম সমবেদনা প্রদর্শন করবে?

৩. তৃতীয়ত, অর্থ মজুত করা অপরাধের শামিল, কারণ জগতের অসংখ্য প্রয়োজনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শেখায় (হিতোপদেশ ৩ : ২৭, ২৮; ১১ : ২৬)। লুক ১৬ অধ্যায়ে দেখি, তার দ্বারপ্রান্তে বসে-থাকা ভিখারিটির জন্য ধনী ব্যক্তির কোনও অনুকম্পা ছিল না। সে যদি তার জানালাটা খুলে পর্দা সরিয়ে একবার বাইরের

দিকে তাকাতো, তবে সে দেখতে পেত, একজন মানুষের করুণ দুর্দশা এবং তার জন্য তার অন্তর কেঁদে উঠত। কিন্তু এ বিষয়ে তার কোন গরজই ছিল না।

পৃথিবীতে শত শত লাসার রয়েছে। তারা আমাদের দরজার পাশে পড়ে রয়েছে। "তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মতো ভালোবাসবে" (মথি ২২ : ৩৯)। আজ যদি আমরা তাঁর কথা না শুনতে চাই, একদিন হয়তো শুনব, তিনি আমাদের বলছেন, "আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে খাদ্য দাওনি, তৃষ্ণার্ত ছিলাম, পানীয় দাওনি,....... এই দীনতমদের মধ্যে কোন একজনের জন্যও যা তোমরা করনি, তা আমারই জন্য করনি" (মথি ২৫ : ৪২, ৪৫)।

৪. খ্রীস্টবিশ্বাসীদের এই পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় করা উচিত নয়, কারণ এর ফলে ঈশ্বরের শত্রুরা ঈশ্বরনিন্দা করার সুযোগ পায় (রোমীয় ২ : ২৪)। এজন্য ভল্‌তেয়ার বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "অর্থের ক্ষেত্রে, সব ধর্মের মানুষই সমান।"

খ্রীস্টকে বিশ্বাস করে পরিত্রাণ লাভ করেনি, এমন বহু মানুষের সঙ্গে খ্রীস্টের শিক্ষার পরিচয় আছে। তারা জানে যে, তিনি প্রতিবেশীকে ভালোবাসার শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারা যখন দেখে, স্বঘোষিত যীশুর অনুগামীরা বাস করছে প্রাসাদোপম গৃহে, বিলাসবহুল গাড়িতে চেপে ভ্রমণ করছে, রাজকীয় খাদ্য আহার ও পোশাক পরিধান করছে, তখন তারা খ্রীস্টের শিক্ষার সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না।

এখন মণ্ডলীর নিদ্রা থেকে জাগরণের কাল। সারা জগতের শিক্ষিত তরুণদের সঙ্গে কথা বলুন। খ্রীস্ট ধর্ম সম্পর্কে তারা কী সমালোচনা করছে, শুনুন। তারা খ্রীস্টীয় নীতির বিরুদ্ধবাদী নয়, কিন্তু তাদের আপত্তি এক জায়গাতেই—মণ্ডলী এবং খ্রীস্টবিশ্বাসীরা ঐশ্বর্যের বন্যায় ভাসছে আর অবশিষ্ট পৃথিবী দরিদ্র-কবলিত হয়ে আছে।

কোন এক ব্যক্তি এক সময় বলেছিলেন, সোনার তৈরি চপ্পলগুলো যখন সিঁড়ি বেয়ে ওঠে, ক্ষুরাকৃতি পেরেক-মারা জুতোগুলোও আর দূরে পড়ে থাকবে না। মণ্ডলী এ কথায় কর্ণপাত করুক।

৫. কিন্তু আমরা শুধু অবিশ্বাসীদের মনোভাবের কথাই চিন্তা করব না। তরুণ বয়সী খ্রীস্টবিশ্বাসীরা কী চিন্তা করছে, তা-ও আমরা ভেবে দেখব।

তরুণ বয়স্ক খ্রীস্টবিশ্বাসীরা তাদের বয়স্ক ব্যক্তিদের জীবনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে। আমরা কীভাবে জীবনযাপন করি, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু রবিবারের উপাসনায় প্রদত্ত উপদেশের মাধ্যমে আমাদের মূল্যবোধ প্রকাশ পায় না; সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত আমরা কীভাবে জীবন যাপন করছি, তার মধ্য দিয়েই আমাদের জীবনের লক্ষ্য প্রকাশিত হয়।

ঈশ্বরের কাজের জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে তরুণরা বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে, তারা যদি দেখে যারা কলমের একটি আঁচড়ে প্রয়োজন পূরণ করতে পারে তারাই

ঈশ্বরের কাজের জন্য সাধারণের কাছে অর্থদানের আবেদন জানাচ্ছে—এই আবেদন তরুণদের মনে কোনই রেখাপাত করতে পারে না।

আমাদের জীবন যদি অর্থসঞ্চয়েই ব্যয়িত হয়, আমরা যদি দেখি; তরুণরা আমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছে, তা হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। এবং প্রভু যীশুর সতর্কবাণী আমরা কখনোই ভুলতে পারি না ঃ "পাপের প্রলোভন নিশ্চিতভাবে আসবে, কিন্তু যার দ্বারা প্রলোভন আসবে, ধিক্ তাকে। এই সাধারণ ব্যক্তিদের একজনকেও পাপে প্রলুব্ধ করার চেয়ে তার গলায় যাঁতা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া বরং তার পক্ষে ভাল (লুক ১৭ : ১, ২)।

৬. সম্পদ সঞ্চয় করা কেন পাপজনক কাজ—তার আর একটি কারণ ঃ এর দ্বারা ঈশ্বরের সম্পত্তিই চুরি করা হয় (মালাখি ৩ : ৮)। আমরা আগেই দেখেছি, আমাদের সবকিছু তাঁরই। আমাদের যা কিছু আছে, তা যদি সরাসরি ঈশ্বরের কাজে ব্যবহার করতে না-পারি, অন্তত, যারা তার সদ্ব্যবহার করতে পারবে, তাদেরই হাতে তুলে দেওয়া উচিত। কাপড়ে জড়িয়ে তুলে রাখলে, ঈশ্বর আমাদের কোন অজুহাতই শুনবেন না (লুক ১৯ : ২০-২৬)।

৭. আর্থিক তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে প্রভুর বাক্য পালন করতে ব্যর্থ হলে, বাইবেলের কিছু অংশকেও আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে (মথি ৬ : ২২, ২৩)। বাইবেলের সহজ সত্যগুলিকেও তখন আমরা দেখতে পাই না।

আমরা যখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবনযাপন করি, তখন বাইবেলের আত্ম-অস্বীকার সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি খুব বেশি প্রাসঙ্গিকতা পায় না। যে-অধ্যায়গুলির উপদেশ আমরা নিজেরা পালন করিনি, তা অপরকে শিক্ষা দিতে পারি না।

৮. অর্থের প্রাচুর্য প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিশ্বাসের জীবনকে বিঘ্নিত করে। কেন? কারণ অর্থশালী লোকের পক্ষে সেই অর্থের উপর নির্ভর না-করা অসম্ভব। সে জানে না, সেই অর্থের উপর সে কতটা নির্ভর করে।

ধনবানের ধনই তাহার দুর নগর,
তাহার বোধে তাহা উচ্চ প্রাচীর। (হিতোপদেশ ১৮ : ১১)

অর্থশালী লোক তার সব সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থের উপর নির্ভর করে। অর্থ দিয়েই সে বর্তমানের আনন্দ ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা পেতে চায়। সেই অর্থ হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেলে, তার অবলম্বন হারিয়ে যায় এবং তার অবস্থা ভীতিকর হয়ে পড়ে।

সত্যি কথা হল, যে-ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না, তাঁর উপর নির্ভর না-করে আমরা ব্যাঙ্কের গচ্ছিত অর্থের (যা আমরা দেখতে পাই) উপর নির্ভর করি।

ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কিছুই নেই, কেউ নেই—এই চিন্তা স্নায়বিক বিপর্যয় ডেকে আনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

তাঁর হাতে সমর্পিত হয়ে আমরা নিজেদের নিরাপদ বলে মনে করতে পারি না, অথচ আমাদের ভবিষ্যৎ যদি আমাদের হাতে থাকে, আমরা নিজেদের আরো বেশি নিরাপদ বলে মনে করি। এই অনুভূতি অবশ্যই খুবই সাধারণ : ঈশ্বরের পিতৃসুলভ তত্ত্বাবধানের উপর অবিশ্বাস করার বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

—স্যামুয়েল কস্‌ক্

ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমরা যেন তাঁর উপর চিরকাল নির্ভর করে চলতে পারি। এই পৃথিবীতে ধনসঞ্চয় করে আমাদের জীবনে তাঁর ইচ্ছাকে আমরা ব্যর্থ করে দিই।

শুধু বিশ্বাসের জীবনই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে; বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব (হিব্রীয় ১১ : ৬)।

বিশ্বাসের জীবনই একমাত্র জীবন যে-জীবনে আছে নিরাপত্তা। "এই প্রতিশ্রুতির ফল শুধু বিশ্বাসবলে লভ্য.... (রোমীয় ৪ : ১৬)।

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত আর কিছুই সুনিশ্চিত নয়। বিশ্বাস-নির্ভর জীবনই দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন।

স্নায়বিক ও আবেগগত বিশৃঙ্খলতা আসে বস্তুবাদ থেকে, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে যে জীবনযাপন করে তার জীবনে এই সমস্যা দেখা দেয় না।

বিশ্বাসের জীবনই একমাত্র জীবন যা ঈশ্বরের মহিমাকীর্তনে মুখর হয়ে ওঠে।

বিশ্বাসের জীবন অবিশ্বাসী ও অন্য খ্রীশ্চানদের কাছে সরব হয়ে ওঠে। এই জীবন সাক্ষ্য দেয় যে, স্বর্গে এক ঈশ্বর আছেন, যিনি প্রার্থনার উত্তর দেন।

বিশ্বাস প্রত্যেক বিষয়ের বিপরীত; আপনি যখন দেখতে পান, তখন বিশ্বাস করতে পারেন না।

ধনসম্পদ সঞ্চয়ের মনোভাব বিশ্বাসের জীবনকে বিঘ্নিত করে। খ্রীস্টবিশ্বাসী হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসের জীবন গড়ে ওঠে না। এর জন্য সক্রিয় হতে হয়। বিশেষত বিত্তবান সমাজে এ কথা আরও বেশি সত্য। বিশ্বাসী নিজেকে এমন অবস্থায় নিয়ে আসবে যেখানে সে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে বাধ্য। তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে সে এই কাজ শুরু করতে পারে।

৯. শুধু তা-ই নয়, আমাদের প্রভু যে-জগতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, যেখানে তাঁর পরিচারকরা লাঞ্ছিত হচ্ছেন, সেখানে রাজা হিসাবে শাসনদণ্ড তুলে নেওয়ার অর্থ, আমাদের প্রভুকেই অসম্মান করা। পৌল করিন্থের অধিবাসীদের এইভাবে চিত্রিত করেছেন—তারা মাথায় মুকুট পরে, সূক্ষ্মতম পোশাক পরিহিত হয়ে মঞ্চের মূল্যবান আসনে বসে আছে। ঠিক একই সময়ে তিনি চিত্রিত করেছেন, বন্য জন্তুর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হবার জন্য প্রেরিতশিষ্যরা বধ্যভূমিতে অপেক্ষা করছেন।

তোমরা অবশ্যই পরিতৃপ্ত! সমৃদ্ধ! আমাদের বাদ দিয়েই তোমরা এখন রাজত্ব করছ। তোমরা রাজত্ব করলে ভালোই হত, তা হলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে রাজত্ব করতে পারতাম।

কিন্তু আমি মনে করি, ঈশ্বর আমাদের অর্থাৎ প্রেরিত-শিষ্যদের স্থান মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীদের মতো সকলের পিছনে নির্দিষ্ট করেছেন। কারণ আমরা জগতের কাছে—স্বর্গদূত ও মানুষের কাছে—হাস্যকৌতুকের পাত্র হয়েছি। খ্রীস্টের জন্য আমরা মূর্খ বলে পরিচিত, কিন্তু খ্রীস্টাশ্রিত তোমরা বুদ্ধিমান। আমরা দূর্বল কিন্তু তোমরা সবল। তোমরা সম্মানিত আর আমরা অবহেলিত। আমরা এখন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত, জীর্ণবশন পরিহিত, অপমানিত। বাসস্থান বলে আমাদের কিছু নেই। নিজেরা পরিশ্রম করে আমরা জীবিকা নির্বাহ করি। কেউ আমাদের গালিগালাজ করলে আমরা আশীর্বাদ করি। নির্যাতন করলে আমরা সহ্য করি। কেউ আমাদের সঙ্গে কর্কশ স্বরে কথা বললে আমরা তার সঙ্গে মিষ্টি কথা বলি।

(১ করিন্থীয় ৪ : ৮-১৩)

খ্রীস্ট স্বয়ং কিরীটভূষিত হবার পূর্বেই করিন্থবাসীরা রাজার মতো শাসন করছে। রাজ্যাভিষেকের সময়, রাজা কিরীটভূষিত হবার পূর্বেই কম মর্যাদাপূর্ণ কেউ যদি মুকুট পরিধান করে, তবে তা অসম্মানজনক।

১০. ধনসম্পদ রাশিকৃত করা প্রভু যীশুর দৃষ্টান্তের বিপরীত। তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না, তবু তাঁর দারিদ্রের মাধ্যমে আমাদের ধনবান করার উদ্দেশ্যে তিনি স্বেচ্ছায় দরিদ্র হলেন (২ করি. ৮ : ৯)।

নতুন নিয়মের মূল ভাষায় 'দরিদ্র' শব্দটির দুটি অর্থ আছে। একটি অর্থে বলা হয়েছে, দারিদ্র কর্মী-মানুষের এমন এক অবস্থা যেখানে জীবনের অবশ্যপ্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়া তার আর কিছু নেই। অন্য অর্থে বলা হয়েছে, স্বেচ্ছায় সম্পদ ত্যাগ করে দারিদ্র বরণ করো। পৌল প্রভু যীশুর ক্ষেত্রে শেষোক্ত অর্থটিই ব্যবহার করেছিলেন।

আমরা কতজন যীশুকে সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করতে চাই?

১১. ধনসম্পদের আর একটি অশুভ দিক আছে। সম্পদ প্রার্থনার জীবনে ক্ষতিকর। যেখানে সমস্ত জাগতিক বস্তু রয়েছে, সেখানে কেন আবার প্রার্থনা?

আমরা নিজেরাই যে-কাজ করতে পারি, সেই কাজের জন্য ঈশ্বরকে অনুরোধ জানাই। অথচ আমরা নিজেরা সেই অর্থ এখনই দিতে পারি। অধিকাংশ সময়েই ঈশ্বরের নিজের অর্থে তাঁর নিজেরই কোনো অধিকার নেই!

১২. সবশেষে, অর্থ পুঞ্জিভূত করা খ্রীস্টবিশ্বাসীদের কাছে ভুল পদ্ধতি। কারণ তাদের ধনসম্পদ দেখে অনেকেই ধনলাভের প্রত্যাশায় খ্রীশ্চান হবার জন্য প্রলোভিত হতে পারে।

প্রাথমিক যুগের বিশ্বাসীদের কাছে দারিদ্র ছিল এক সম্পদ, বাধ্যবাধকতা নয় ঃ

> যে ধর্ম জগৎকে ওলটপালট করে দিয়েছিল, তার প্রাথমিক প্রচারকরা সকলেই ছিলেন দ্ররিদ্র। প্রচারকদের যদি শ্রোতৃমণ্ডলীকে দেবার মতো অর্থসম্বল থাকত, অথবা সৈন্যসামন্তর সহায়তায় তাদের ভীতি প্রদর্শন করতেন, তা হলে, তাদের সাফল্যের অন্তরালে কিছু যে বিস্ময়কর জিনিসের ভূমিকা আছে, অবিশ্বাসীরা তা অস্বীকার করত। কিন্তু আমাদের প্রভুর শিষ্যদের দারিদ্র অবিশ্বাসীদের এই সুযোগকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে সবচেয়ে বিরক্তিকর একটা মতবাদ, বকশিস দেবার বা বাধ্য করার মতো কিছু নেই যার মধ্যে—তা-ই দিয়েই কয়েকজন গ্যালিলীয় জগৎকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং রোমসম্রাটের মুখের চেহারা পাল্টে দিয়েছিল। এ জন্য শুধু একটি বিষয়কেই গুরুত্ব দেওয়া যায়। এই লোকদের ঘোষিত খ্রীস্টের সুসমাচারই ছিল ঈশ্বরের সত্য।
>
> —জে. সি. রাইল

প্রখ্যাত এক ব্যক্তি এক সময় লিখেছিলেন ঃ

> আমি যদি ধনী অবস্থায় তাদের মধ্যে যেতাম, তারা সবসময় আমার কাছে ভিক্ষা করত। হয়তো অন্য সবকিছুর চেয়ে আমাকে উপহার লাভের উৎস মনে করে বেশি শ্রদ্ধা করত। আমি যদি সুসমাচার ছাড়া আর কিছু আমার সঙ্গে না-নিয়ে যেতাম, তবে এই অনির্বচনীয় উপহার থেকে তাদের দৃষ্টি আর কোনো দিকে আকর্ষিত হত না।

পিতর ও যোহনের সঙ্গে মন্দিরদ্বারে এক খঞ্জ ভিখারির সাক্ষাৎ হয়েছিল। সে তাঁদের কাছে ভিক্ষা চাইলে পিতর বলেছিলেন, "সোনা বা রূপো আমার কিছুই নেই; কিন্তু আমার যা আছে, তা-ই তোমাকে দিচ্ছি। নাজারেথের যীশুখ্রীস্টের নামে তুমি উঠে দাঁড়াও" (প্রেরিত ৩ : ৬)।

হয়তো কেউ কেউ বলবে, প্রচারকদের দরিদ্র হওয়া উচিত, কিন্তু সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসীর ক্ষেত্রে তা প্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু প্রচারক এবং অন্যদের, মিশনারি বা গৃহীদের জন্য বাইবেল কোথায় ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক মান সম্পর্কে আলোচনা করেছে?

অব্যবহৃত সম্পদ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক

তা হলে, খ্রীস্টবিশ্বাসীদের সম্পদ সঞ্চয় অন্যায় কেন! যে-সমস্ত বিশ্বাসী তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করেছেন, তাঁরা এর সমর্থনে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করে থাকেন আমরা সেগুলি আলোচনা করে দেখব।

১. প্রথম যুক্তিটি এই ধরনের ঃ আমাদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা উচিত। যখন আমরা আর কর্মক্ষম থাকব না, তখন কী হবে? আমাদের দুর্দিনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। ঈশ্বর চান, আমরা যেন আমাদের সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করি।

এই যুক্তি সমর্থনযোগ্য বলেই মনে হয়, কিন্তু এখানে বিশ্বাসের কথা নেই। ঈশ্বর-নির্ভরতার পরিবর্তে সম্পদই তখন আমাদের অবলম্বন হয়। যখন আমরা দেখতে পাই, তখন আমরা নির্ভর করতে পারি না।

কিন্তু একবার যদি আমরা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে শুরু করি, তবে সেই পথে ছুটে চলি। কত পরিমাণ অর্থ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে? আমরা কতদিন বাঁচব? বাজার-মন্দা হবে কি? মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে কি? আমাদের কি চিকিৎসা-খাতে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হবে?

কত পরিমাণ অর্থ যথেষ্ট হবে, তা জানা সম্ভব নয়। তাই স্বল্পকালস্থায়ী অবসর জীবনের জন্য অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে আমার বেশির ভাগ জীবন ব্যয় করে থাকি। এই সময় কালে, আমরা ঈশ্বরের অর্থে দস্যুবৃত্তি করি, এবং যেখানে নিরাপত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনই জিনিসের জন্য জীবন ব্যয় করি।

বর্তমান প্রয়োজনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা, প্রভুর জন্য প্রাণপণ করা এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রভুর উপর নির্ভর করাই শ্রেয়। যারা তাঁকে অগ্রাধিকার দেয়, তাদের তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

...... এ সবই তিনি তোমাদের জুগিয়ে দেবেন (মথি ৬ : ৩৩)।

সত্যকে প্রচারের জন্য যারা প্রভুর অর্থ ব্যবহার করছিল সেই ফিলিপীয়দের উদ্দেশে পৌল লিখেছিলেন,

আমার ঈশ্বর খ্রীস্ট যীশুর মাধ্যমে তাঁর সুমহান ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার থেকে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন (ফিলিপীয় ৪ : ১৯)।

বর্তমান কালে একটা বিয়োগান্তক দর্শন লক্ষ করা যাচ্ছে—মানুষ অর্থ সঞ্চয়ের জন্য জীবনের সিংহভাগ এই আশায় ব্যয় করছে যে, তার অবসর জীবন প্রভুর সেবায় নিয়োগ করবে। এর অর্থ, আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলি চাকরির জন্য ব্যয় করছি এবং পড়ে-থাকা অবসরের জীবন দিচ্ছি যীশুকে। এবং জীবনের এই সায়াহ্নবেলা খুবই অনিশ্চিত। কখনো কখনো দেখা যায়, বাইবেলের ধূলো ঝেড়ে পরিস্কার করার আগেই জীবন শেষ হয়ে গেল!

দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই

বিষয়ের সত্যটি ক্যামেরন টম্‌সনের লেখায় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছেঃ কিছুই চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে না মনে করে যারা উদ্বিগ্ন, ঈশ্বর তাদেরই উপর তাঁর পছন্দসই আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। জগতের বর্তমান যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে যে দুর্দিনকে বেশি মূল্য দেয়, সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করবে না।

২. ১তীমথি ৫ : ৮ পদটিকে ভিত্তি করে অর্থ সঞ্চয়ের পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তিটি গড়ে উঠেছে ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার আত্মীয়-স্বজনদের, বিশেষ করে নিজের পরিবারের লোকদের কথা চিন্তা না করে, তা হলে সে তার খ্রীস্টবিশ্বাস পরিত্যাগ করেছে।''

এই অংশে পৌল মণ্ডলীতে বিধবাদের তত্ত্বাবধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন, বিধবার তত্ত্বাবধানের জন্য তার বিশ্বাসী আত্মীয়-স্বজনদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু তার কোনো আত্মীয়-স্বজন না-থাকলে মণ্ডলী তার দায়িত্ব নেবে।

কিন্তু একটি লক্ষণীয় বিষয়, ভবিষ্যতে বিধবাদের ভরণ-পোষণের জন্য পৌল পৃথকভাবে অর্থসঞ্চয়ের কথা বলেননি। বরং, তিনি তার বর্তমান প্রয়োজনের কথা বলেছেন। খ্রীস্টবিশ্বাসীকে দিনের পর দিন তাদের অবহেলিত স্বজনদের তত্ত্বাবধান করতে হবে। যদি তা না করে, তারা খ্রীস্টবিশ্বাসকে বাস্তবে অস্বীকার করছে, যেখানে ভালোবাসা এবং বদান্যতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এমন-কী অবিশ্বাসীরা তাদের পরিজনদের তত্ত্বাবধান করে থাকে। তাই কোনো বিশ্বাসী অবিশ্বাসীর চেয়ে নিকৃষ্ট প্রকৃতির হবে না।

এই পদটিতে ভবিষ্যতের সঞ্চয়, বৃত্তি বা আমানত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। পদটিতে ভবিষ্যতের নয়, বর্তমানের প্রয়োজনের কথাই বলা হয়েছে।

৩. তৃতীয় যুক্তিটি দ্বিতীয়র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বহু খ্রীস্টবিশ্বাসী পিতামাতা মনে করেন যে, তাঁদের সন্তানদের জন্য বেশ মোটা রকমের অর্থ রেখে যাওয়া কর্তব্য। তাঁরা মনে করেন, 'পরিবারের লোকদের জন্য চিন্তা' করা বলতে এ কথাই বোঝানো হয়েছে (১ তীমথি ৫ : ৮)। এ ক্ষেত্রে, সন্তানরা বিশ্বাসী কি না, তা বিচার্য নয়। তাঁদের একটাই ইচ্ছা, তাদের জন্য বেশ ভালো রকম সঞ্চয় রেখে যেতে হবে।

কখনো কখনো ২ করিন্থীয় ১২ : ১৪ পদটি এই শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহার করা হয় যে, সন্তানদের সংস্থান রেখে যাবার জন্য পিতামাতারা সঞ্চয় করবে। অংশটিতে বলা হয়েছে,

> .....পিতামাতার জন্য সন্তানদের নয়, বরং সন্তানদের জন্য পিতামাতার সংস্থান করা উচিত।

এখানে মূলত পৌলের আর্থিক সাহায্য লাভ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি করিন্থীয়দের কাছ থেকে কোনো আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেননি, কিন্তু করিন্থ

নগরে প্রচারকালে বিভিন্ন মণ্ডলীর কাছ থেকে তিনি বিভিন্ন উপহার লাভ করছিলেন (২ করি. ১১ : ৭, ৮)। তখন তিনি আবার করিন্থে যাবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তিনি তাদের নিশ্চয়তা দিলেন যে, তিনি তাদের বোঝা স্বরূপ হবেন না (১২ : ১৪)। অর্থাৎ কোনো আর্থিক সাহায্যের জন্য তিনি তাদের উপর নির্ভর করবেন না। তাদের পার্থিব সম্পদ সম্পর্কে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই, তাদের আত্মিক যুদ্ধের জন্যই তাঁর আগ্রহ।

এই প্রসঙ্গে তিনি যোগ করেছেন, "......পিতামাতার জন্য সন্তানদের নয়, বরং সন্তানদের জন্য পিতামাতার সংস্থান করা উচিত।"

করিন্থীয়রা সন্তান এবং পৌল পিতামাতার সদৃশ (১ করি. ৪ : ১৫)। তিনি তাদের বলছেন—অবশ্যই ব্যাজস্তুতির মাধ্যমে—যে, তারা তাঁকে সাহায্য করবে না; বরং তাঁরই তাদের সাহায্য করা উচিত। এ কথা তিনি ব্যাজস্তুতির মাধ্যমে বলেছেন, কারণ প্রকৃতপক্ষে তাদের পৌলকে সাহায্য করা উচিত (১ করি. ৯ : ১১, ১৪)।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের লক্ষ করা দরকার যে, এই অংশটিতে ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। সেটা আদৌ আলোচ্য বিষয়ই নয়। এ বর্তমান প্রয়োজনের বিষয়, এবং পৌল বলছেন, "সন্তানরা সাধারণত পিতামাতাকে অর্থ সাহায্য করে না; পিতামাতারাই সন্তানদের তত্ত্বাবধান করেন।

প্রকৃতপক্ষে, সন্তানদের জন্য অর্থসঞ্চয়ের প্রবণতাকে নতুন নিয়মে উৎসাহ দেওয়া হয়নি। উত্তরাধিকার রূপে পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের সবচেয়ে বড়ো যে জিনিসটি দিতে পারেন, তা হল আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু সন্তানদের জন্য অর্থসঞ্চয়ের প্রবণতা এই উত্তরাধিকার-দানের পথে বাধা স্বরূপ।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিয়ে যে, অশুভর প্রকাশ ঘটে, খ্রীস্টবিশ্বাসীদের সে কথাও ভেবে দেখা উচিত।

ক) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হঠাৎ বিপুল অর্থের অধিকারী হয়ে বহু ক্রীশ্চান যুবকের অধ্যাত্মজীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা জাগতিক আমোদ-প্রমোদে ভেসে গেছে এবং খ্রীস্টের পরিচর্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

খ) উইল এবং সম্পত্তি নিয়ে পরিবারের শান্তির বাতাবরণ কীভাবে নষ্ট হয়, সে কথাও ভেবে দেখুন। এক বোন আর এক বোনের প্রতি, এক ভাই আর এক ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়েছে। জীবনের বাকি দিনগুলি ঝগড়া বিবাদ করে কাটিয়ে দিয়েছে।

লুক ১২ : ১৩, ১৪ পদে উত্তরাধিকার নিয়ে পারিবারিক বিবাদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই বিষয়ে যীশু নিজেকে জড়িত করতে চাননি। এই রকম কাজের জন্য তিনি পৃথিবীতে আসেননি। কিন্তু উইলে যে অসুখী লোকটির নামোল্লেখ করা হয়নি, তার অর্থলোলুপতার বিরুদ্ধে যীশু সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

গ) এখন এই হল পরিস্থিতি। মৃত্যুর পর সন্তানদের জন্য টাকাকড়ি রেখে যাবার জন্য পিতামাতা কঠোর পরিশ্রম করেন। এর পর তাঁদের বয়স হয়, শরীর অক্ষম হয়ে পড়ে। অকৃতজ্ঞ সন্তানরা তাদের হাতে সেই সঞ্চিত অর্থ পাবার জন্য বড়ো জোর পিতামাতার মৃত্যুর পর্যন্ত অপেক্ষা করে।

ঘ) সেই অর্থ যখন পরিত্রাণহীন সন্তান বা খ্রীস্টবিশ্বাসী সন্তানের হাতে পড়ে এবং তারা যখন কোনো অবিশ্বাসী বা অবিশ্বাসিনীকে বিবাহ করে, সেই অর্থ তখন সুসমাচার প্রচারের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। চিন্তা করে দেখুন! বিশ্বাসীর সঞ্চিত অর্থ সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে!

ঙ) এর পর আমাদের চিন্তা করতে হবে, বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ-কর হিসাবে সরকারের ঘরে এবং আইন-সংক্রান্ত পরামর্শ দানের জন্য উকিলের পকেটে যায়। এই অর্থ মানুষের পরিত্রাণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারত।

চ) কিছু খ্রীস্টবিশ্বাসী এই সমস্ত দু:খ-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তাঁদের অর্থ খ্রীস্টীয় প্রতিষ্ঠানে দান করে যান। কিন্তু এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, সেই অর্থ এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান পাবেই। উইল নিয়ে সব সময় লড়াই লেগেই আছে। এ ছাড়া, শাস্ত্রবাক্য মৃত্যুর পর সঞ্চিত অর্থ রেখে যাওয়াকে সমর্থন করে না। এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, উইলের স্বত্ব দখল নেবার সময় এই সব সংস্থা প্রভু এবং তাঁর বাক্যের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলবে।

বিশ্বাসীরা যে-অর্থ রেখে যায়, তার জন্য তারা পুরস্কৃত হবে না। যে-মুহূর্তে তারা মারা যায়, সেই অর্থ তখন আর তাদের থাকে না। এই সম্পত্তি লাভ করে তাদের উত্তরাধিকারীরা।

মানুষ ধনদৌলত সঞ্চয় করে, কিন্তু জানে না, কে তা ভোগ দখল করবে (গীতসংহিতা ৩৯ : ৬)। আপনার অর্থ প্রভুর কাজেই সুনিশ্চিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে জানতে হলে আপনাকে জীবিতকালেই দান করতে হবে। এবং একমাত্র এই ভাবেই আপনি ভবিষ্যতের পুরস্কার লাভ করতে পারেন।

আমরা বলি, প্রভুর আগমন আসন্ন এবং আমরা তা বিশ্বাসও করি। তা হলে, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, প্রভুর আগমন যত আসন্ন হবে, জাগতিক সম্পত্তি ততই মূল্যহীন হয়ে পড়বে। তাঁর আগমন হলে, আমাদের অর্থ ঈশ্বরের কোনো কাজে লাগবে না। তাই আমাদের ধনদৌলত যীশুর কাজের জন্য *এখনই* ব্যবহার করতে হবে।

৪. তা হলে, একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, আমরা কীভাবে জীবনযাপন করব? এর উত্তর, "দৃশ্য বস্তুর দ্বারা কম, বিশ্বাসের দ্বারা বেশি।"

মণ্ডলীর প্রাথমিক যুগে বিশ্বাস কার্যকর হয়েছিল বলে এখন তা কার্যকর নয়—এমন যুক্তি প্রদর্শনের কোনো কারণ নেই।

> খ্রীস্টবিশ্বাসীরা সকলে একসঙ্গে থাকতেন এবং একই ভাণ্ডার থেকে তাঁদের প্রয়োজন মিটান হত। নিজেদের সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে যার যা প্রয়োজন তা মিটাতেন (প্রেরিত ২ : ৪৪, ৪৫)।
>
> তাই তাঁদের দলে কারো কোনো অভাব ছিল না। দলে যাঁরা বাড়ি বা জমির মালিক ছিলেন, তাঁরা সকলে নিজেদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে সব অর্থ প্রেরিত শিষ্যদের চরণে এনে অর্পণ করতেন। এখান থেকেই প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুয়ায়ী চাহিদা মিটান হত (প্রেরিত ৪ : ৩৪, ৩৫)।

করিন্থীয়দের কাছে লিখতে গিয়ে পৌল শিক্ষা দিয়েছেন, আমাদের জাগতিক ধনদৌলত হবে তরল পদার্থের মতো, ঘনীভূত নয়। কোনো সত্যিকারের প্রয়োজনের সময়, আমাদের অর্থভাণ্ডার থেকে সেই প্রয়োজন মেটাতে হবে। আমরা নিজেরা যদি কখনো দু:সময়ে পতিত হই, অর্থভাণ্ডার থেকে আমাদের সেইভাবে অর্থসাহায্য দেওয়া হবে। ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে এইভাবে সমতা রক্ষিত হবে।

> একথা বলছি না যে অন্যেরা সুখে থাক আর তোমরাই শুধু কষ্টভোগ করবে, তবে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য বর্তমানে তোমাদের উদ্বৃত্ত থেকে তাদের অভাব পূরণ কর যেন পরে কোন সময়ে তাদের উদ্বৃত্ত থেকে তোমাদের অভাব পূরণ হতে পারে। এই ভাবেই সমতা বজায় রাখা যাবে। শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, "যে বেশি সংগ্রহ করল, তার উদ্বৃত্ত কিছু থাকল না এবং যে অল্প সংগ্রহ করল তার ঘাটতি হল না" (২ করি. ৮ : ১৩-১৫)।

অন্যভাবে বলা যায়, কোনো লোক যদি প্রকৃত অর্থেই প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে জীবন যাপন করে এবং তার সম্পত্তি বিশ্বস্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে, অন্য বিশ্বাসীরাও ইচ্ছুক হয়ে উঠবে এবং প্রয়োজন দেখা দিলে সানন্দে তাদের সম্পত্তির অংশ দেবে।

আমরা যদি সৎ হই, আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, পরনির্ভরশীলতার চিন্তা আমাদের কাছে বেমানান। আমাদের স্বাবলম্বিতার জন্য আমরা গর্বিত। কিন্তু এ কি আমাদের মধ্যে প্রভু যীশুর জীবন না হয়ে ব্যক্তি-জীবনের প্রকাশ নয়?

১ তীমথি ৫ : ৩-১৩ পদে পৌল বিধবাদের সম্পর্কে নির্দেশ দিতে গিয়ে এমন মণ্ডলীর কথা বলছেন যেখানে ঈশ্বরের ভালোবাসা মানুষের হৃদয়ে বাহিত হয়, যেখানে ভক্তজনরা পরস্পরের প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়ায়, যেখানে সত্যিকারের প্রয়োজনের সময় অকাতরে ব্যয় করা হয়।

এবং তর্ক উঠতে পারে, আদিম মণ্ডলীতে এইভাবে কাজ হলেও আজকের দিনে তা অসম্ভব। এর সহজ সরল উত্তর একটিই—আজও এইভাবেই কাজ হয়ে চলেছে।

বহু খ্রীস্টবিশ্বাসী এইভাবে তাঁদের বিশ্বাসের জীবন যাপন করছেন। তাঁদের জীবনে যে পরাক্রম ও আকর্ষণী শক্তি রয়েছে, কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না।

৫. কিন্তু কেউ কেউ আপত্তি তুলবে, "পৌল কি বলেননি, 'আমি দীন হতে জানি, আবার প্রাচুর্যের সঙ্গেও আমার পরিচয় আছে?' " (ফিলিপীয় ৪ : ১২)। এই প্রশ্নটিতে আমাদের চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে ওঠে—দীনহীন পৌল পথহীন মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন; ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত, ছিন্নবস্ত্র পরিহিত। এর পর আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল প্রাচুর্য মণ্ডিত পৌলের ছবি—সমুদ্রতীরবর্তী কোনো প্রমোদস্থানে তাঁর রথ থেকে তিনি অবতরণ করছেন। পরণে তাঁর সর্বাধুনিক পোশাক। অন্যভাবে বলা যায়, তিনি দারিদ্র বা প্রাচুর্য উভয়ের মধ্যে বসবাস করতে পারেন।

কিন্তু ফিলিপীয় পত্রে পৌল ঠিক এ কথা বলছেন না। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই পত্রটি লিখিত হয়েছিল *কারাগার* থেকে, সমুদ্রতীরবর্তী কোনো প্রামোদ কানন থেকে নয়। কারাগার থেকে লেখার সময় তিনি বলেছিলেন,

> আমি সবকিছুই পেয়েছি, প্রচুর পরিমাণেই পেয়েছি। ইপাফ্রদীতের মারফত তোমাদের কাছ থেকে যা পেয়েছি তাতে আমার অভাব মিটেছে।.....(ফিলিপীয় ৪ : ১৮)।

আমরা ভাবতে পারি, বন্দিত্ব *মর্যাদা হানিকর*, কিন্তু পৌল একে প্রাচুর্যময় করে তুলেছিলেন। তাই, প্রাচুর্যময় ও বিলাসী জীবন যাপনকে সমর্থন করার জন্য ফিলিপীয় ৪ : ১২ পদটি ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নয়।

৬. তা হলে ১ তীমথি ৬ : ১৭ পদটি সম্পর্কে আমরা কী বলব, যেখানে বলা হয়েছে, 'আমাদের ভোগের জন্য ঈশ্বর সবকিছু দেন'? বিশ্বাসীরা "জীবনের উত্তম বিষয়গুলি" ভোগ করবে—এর প্রমাণ হিসাবে এই পদটি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ এর দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে, বিশ্বাসী সর্বাধুনিক এবং সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জিনিসগুলি ভোগ করতে পারে। তার স্লোগান, "ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য খুব ভালো বলে কিছু নেই।"

কিন্তু সে আর একবার প্রসঙ্গ ভুলে যায়। লক্ষ করুন, পদটি কীভাবে শুরু হয়েছে, "এই সংসারে যারা ধনী তাদের বল, তারা যেন অহঙ্কার না করে, মায়াময় ঐশ্বর্যের উপর ভরসা না রাখে।" অন্য ভাষায় বলা যায়, আরামপ্রিয়তার সমর্থনে অজুহাত না দেখিয়ে, শব্দগুলি এমন একটি অংশে পাওয়া গিয়েছে, যেখানে ধনীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে।

'আমাদের ভোগের জন্য' ঈশ্বর 'সবকিছু দেন'—এ কথার অর্থ কী? এর অর্থ, তিনি মজুত করার জন্য এই সমস্ত বিষয় দেননি; তিনি চান, অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে তা যেন আমরা *উপভোগ* করি। নিচের দুটি পদে তা সুস্পষ্ট হয়েছে ঃ

> .....তারা যেন পরসেবাব্রতী হয়, সৎকর্মের সম্পদে সমৃদ্ধ হয়, মুক্তহস্তে দান করে এবং সকলকে তাদের সমাজের ভাগীদার মনে করে। এইভাবে তারা ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ী সম্পদ সঞ্চয় করে যথার্থই জীবনের অধিকারী হবে (১ তীমথি ৬ : ১৮,১৯)।

ধনদৌলত মজুত করে রেখে তা উপভোগ করা যায় না, ঈশ্বরের গৌরবের ও অপরের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে তা ভোগ করতে হয়।

৭. অনেক সময় আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে, অব্রাহাম ধনী ব্যক্তি ছিলেন (আদি পুস্তক ১৩ : ২), তবুও তাঁকে ঈশ্বরের বন্ধু বলা হত (যাকোব ২ : ২৩)। এ কথা অবশ্য সত্য, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আব্রাহাম বাস করতেন পুরাতন নিয়মের যুগে। সেই যুগে যারা প্রভুকে ভালোবাসে, তাদের জাগতির সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ধনসম্পত্তি ঈশ্বরের আশীর্বাদের চিহ্ন।

ঈশ্বরের অনুগ্রহের যুগেও কি এ কথা সত্য? এ কথা বললে বরং আরও সঠিক বলা হবে যে, প্রতিকূলতাই এই যুগের আশীর্বাদ।

লাসার এবং ধনী ব্যক্তির কাহিনীটি (লুক ১৬ : ১৯-৩১) পুরাতন নিয়মের মানের বিপরীত। ধনী ব্যক্তিটি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, কারণ সে তার অর্থ অপরের জন্য ব্যবহার না-করে নিজের জন্য মজুত করেছিল।

৮. এর পর আমাদের কি পিঁপড়ের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার উপদেশ দেওয়া হয়নি?

> হে অলস, তুমি পিপীলিকার কাছে যাও, তাহার ক্রিয়াসকল দেখিয়া জ্ঞানবান হও। তাহার বিচারকর্তা কেহ নাই, শাসনকর্তা কি অধ্যক্ষ কেহ নাই, তবু সে গ্রীষ্মকালে আপন খাদ্য প্রস্তুত করে, শস্য কাটিবার সময়ে ভক্ষ্য সঞ্চয় করে (হিতোপদেশ ৬ : ৬-৮)।

এই পদগুলিতে বলা হয়েছে, পিঁপড়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের কি তাদের অনুকরণ করতে বলা হয়নি? হ্যাঁ, কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, পিঁপড়ের ভবিষ্যৎ এই পৃথিবীতে, কিন্তু খ্রীস্টবিশ্বাসীর ভবিষ্যৎ স্বর্গে। এই পৃথিবীতে বিশ্বাসী তীর্থযাত্রীর মতো, সে এখানে প্রবাসী। তার গৃহ ঊর্ধ্বে। এবং মানুষের *উচিত* তার ভবিষ্যতের জন্য ঊর্ধ্বে ধন সঞ্চয় করা।

কিন্তু অশনবসন নিয়ে আগামী দিনের জন্য দুশ্চিন্তা করতে তাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে (মথি ৬ : ২৫)। বরং আকাশের পাখিদের অনুকরণ করতে বলা হয়েছে, যারা তাদের বাসায় খাদ্য সঞ্চয় করে না—স্বর্গীয় পিতা যাদের আহার জুগিয়ে থাকেন। এবং যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, ঈশ্বর যদি দাঁড়কাকদের জন্যও চিন্তা করেন, তবে আমাদের জন্য তিনি আরও কত বেশি চিন্তা করবেন!

৯. সবশেষ যুক্তি দেখানো যেতে পারে, ধনীদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দেবার জন্য ধনী হতে হবে। মণ্ডলীর প্রাথমিক পার্বের বিশ্বাসীরা এ কথা উপলব্ধি করতে পারেনি। ‘ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাথমিক যুগের খ্রীস্টবিশ্বাসীদের অনেকে সর্বত্র খ্রীস্টের সুসমাচার প্রচারের জন্য এত আগ্রহী ছিল যে, তারা পরিচারকরূপে ভাড়া খাটতো এবং নিজেদের ক্রীতদাস রূপে বিক্রি করে দিত। এর দ্বারা তার ধনী ব্যক্তি বা অবিশ্বাসীদের গৃহে আশ্রয় লাভ করত। তারা সেখানে থাকত এবং এই সব গৃহে যীশুর ভালোবাসা এবং পরিত্রাণের কথা বলার সুযোগ পেত’’ (জে. আর মিলার)।

বাইবেল কী বলে?

যে-পৃথিবীতে নিষ্করুণ দরিদ্র আধিপত্য করে চলেছে সেখানে খ্রীস্টবিশ্বাসীরা ধনসম্পদের ঘেরাটোপে জীবন যাপন করতে পারে কি না, এ বিষয়ে আমরা কতকগুলি নীতি আলোচনা করেছি।

ঈশ্বরের বাক্যে এর কতকগুলি বিরুদ্ধ যুক্তি আমরা দেখতে পাই। সেগুলি ধনদৌলতের বিপদ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দেয়।

১. “বিশ্বস্ত লোক অনেক আশীর্বাদ পাইবে, কিন্তু যে ধনবান হইবার জন্য তাড়াতাড়ি করে সে অদণ্ডিত থাকিবে না। .....যাহার চক্ষু মন্দ, সে ধনের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত; সে জানে না, দীনতা তাহাকে ধরিবে” (হিতোপদেশ ২৮ : ২০, ২২)।

যে-মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে এবং তাঁর সাদৃশ্যে নির্মিত হয়েছে, সেই মানুষ যদি উন্মত্তের মতো অর্থের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, তার পক্ষে তা অযোগ্যতার বিষয়।

২. “কোন দাসই দুই মনিবের সেবা করতে পারে না। সে একজনকে ঘৃণা করবে, অন্যজনকে ভালোবাসবে; একজনের অনুগত হবে এবং অন্যজনকে অবজ্ঞা করবে। তোমরাও ঈশ্বরের সেবা ও ধনদেবতার সেবা—এ দুটো কাজ একই সঙ্গে করতে পারো না” (মথি ৬ : ২৪)।

এখানে ঈশ্বর এবং অর্থকে দুই প্রভু রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই দুটি এত বিরুদ্ধ যে, কোন মানুষের পক্ষে একই সঙ্গে দুই-য়ের সেবা করা সম্ভব নয়। যীশু বলেছিলেন, এই দুটির যে-কোন একটিকে আমাদের মনোনীত করতে হবে।

৩. “যীশু তখন তাঁর শিষ্যদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা দুরূহ। আবার তোমাদের বলছি, স্বর্গরাজ্যে ধনীর প্রবেশ করার চেয়ে সূচের ছিদ্র পথে উটের প্রবেশ করা সহজতর।” এ কথা শুনে শিষ্যরা খুবই বিস্মিত হয়ে বললেন, “তা হলে পরিত্রাণ পাবে কে?” তাঁদের দিকে তাকিয়ে যীশু বললেন, “মানুষের পক্ষে এ সাধ্যের অতীত, কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য কিছু নেই” (মথি ১৯ : ২৩-২৬)।

যীশুর এই কথাগুলি গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করলে আমার মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। তিনি বলেননি যে, মানুষের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কষ্টকর; তিনি বলেছিলেন, তা মানবিকভাবে অসম্ভব।

কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেন যে, সূচের ছিদ্র বলতে নগরদ্বারের ছোট দরজাকে বোঝানো হয়েছে। এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হলে উটকে নিচু হতে হবে। কিন্তু এখানে সূচ বলতে সেলাইয়ের সূচের কথা বলা হয়েছে—কোনো উটই এর মধ্য দিয়ে যেতে পারে না।

কেবল দিব্যক্ষমতার এক বিশেষ অলৌকিকতার মাধ্যমে ধনী ব্যক্তি ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে। তা হলে, মানুষের চিরন্তন সংগ্রামের ক্ষেত্রে যে-জিনিসটি এক বিস্ময়কর, তার জন্য আমরা এত প্রাণপণ চেষ্টা করব কেন?

৪. ''কিন্তু হায় ধনীকুল, দুর্ভাগ্য তোমাদের, তোমরা আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে গিয়েছ'' (লুক ৬ : ২৪)।

এখানে ঈশ্বরের পবিত্র সন্তান ধনী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছেন। বর্তমান ক্ষেত্রে শব্দটি আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। এখানে *ধনী* শব্দের অর্থ ধনী ব্যতীত আর কিছু নয়। তা হলে ঈশ্বর যাদের আশীর্বাদ করেননি, আমরা তাদের জন্য আশীর্বাদ কামনা করব কেন?

৫. ''তোমাদের সম্পত্তি বিক্রি করে বিলিয়ে দাও। কোন দিন পুরণো হবে না, এমন একটি থলির ব্যবস্থা কর, তার মধ্যে স্বর্গীয় সম্পদ সঞ্চয় কর—কোন দিন তা নষ্ট হবে না। সেখানে চোরও আসে না কিংবা পোকায়ও কাটে না। কারণ যেখানে তোমাদের সম্পদ, সেখানেই তোমাদের মন পড়ে থাকবে'' (লুক ১২ : ৩৩, ৩৪)।

এই বাণী উচ্চারিত হয়েছিল শিষ্যদের উদ্দেশে (২২ পদ দেখুন)। এগুলি আমাদের উদ্দেশে কথিত হয়নি মনে করে আমরা একে এড়িয়ে যেতে চাই। কিন্তু আমাদের প্রতি নয় কেন? এই পদগুলির প্রতিরোধ করতে গিয়ে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদকে প্রতিরোধ করি।

এই অনুগ্রহের যুগে আমাদের সম্পত্তি—আমাদের হীরা জহরত, মূল্যবান চিত্র, পুরণো দিনের আসবাবপত্র, রৌপ্য, ডাকটিকিট—ইত্যাদি বিক্রি করে জগতের পরিত্রাণের জন্য ব্যয় করা খুবই সঙ্গতিপূর্ণ।

আমাদের মন কোথায়? আপনার মন কি ব্যাঙ্কে, অথবা স্বর্গে? যেখানে আমাদের ধন, আমাদের মনও থাকবে সেখানে।

৬. ''এ কথা শুনে যীশু তাঁকে বললেন, 'এখনও তোমার একটা জিনিসের অভাব রয়েছে। তোমার যা কিছু আছে, সমস্ত বিক্রি করে গরিবদের বিলিয়ে দাও। তা হলে

স্বর্গে তোমার ধন সঞ্চিত হবে। তার পর এসো, আমার অনুসরণ কর।' এ কথা শুনে সে দু:খিত হল, কারণ সে ছিল বিরাট ধনী ব্যক্তি'' (লুক ১৮ : ২২, ২৩)।

আমাদের সর্বদা বলা হয়ে থাকে যে, ধনী ব্যক্তির কাহিনীটি স্বতন্ত্র এবং আমাদের প্রত্যেককে ধনসম্পত্তি বিক্রয় করার আদেশ দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও, এইমাত্র শাস্ত্রের যে-অংশটি আমরা আলোচনা করেছি, এই অংশের শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে পৃথক নয় (লুক ১২ : ৩৩, ৩৪)।

৭. ''ধর্ম অবশ্যই ধনী করে যদি আমরা নির্লোভ হই। কারণ এ জগতে আমরা শূন্য হাতে এসেছি, শূন্য হাতেই যাব। সুতরাং যদি আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান থাকে, তা হলে তা-ই যথেষ্ট। যারা ধনী হতে চায়, তারা নানা প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে এবং নানা রকম নিরর্থক ক্ষতিকর বাসনার জন্য তারা সমূহ সর্বনাশের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। সব রকম অনর্থের মূলেই আছে অর্থলিপ্সা। অর্থের আকর্ষণে অনেকে বিশ্বাসচ্যুত হয়ে নিদারুণ যন্ত্রণার শূলে বিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তুমি ঈশ্বরের সেবক, তুমি এ সব এড়িয়ে চল। তোমার জীবনের লক্ষ্য হোক ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা, ধর্মশীলতা, বিশ্বাস, ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা এবং অমায়িকতা'' (১ তীমথি ৬ : ৬, ১১)।

পৌল সতর্ক করে দিয়েছেন, যারা অর্থলিপ্সু, তারা নিজেদের জীবনে অনেক দু:খ ডেকে আনে। তিনি কোন কোন দু:খের কথা বলেছেন?

ক) প্রথম, সম্পদ অবশ্যম্ভাবী রূপে দু:শ্চিন্তা ডেকে আনে। ''ধনবানের পূর্ণতা তাহাকে নিদ্রা যাইতে দেয় না'' (উপদেশক ৫ : ১২)। যে-ধনসম্পদ নিরাপত্তা আনার কথা, প্রকৃতপক্ষে তা হয় বিপরীত—সব সময় চুরি যাবার ভয়, মন্দা-বাজার বা মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা ইত্যাদি।

খ) দ্বিতীয় দু:খদায়ক ঘটনা—সম্পদের প্রাচুর্যে অনেকেরই সন্তান আধ্যাত্মিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। খুব কম সংখ্যকই ধনী খ্রীশ্চান পিতামাতার সন্তান প্রভুর পথে সঠিকভাবে এগিয়ে চলে।

গ) এর পর যে-সময়ে আপনার অর্থের প্রয়োজন, সেই সময়ে না-পেলে আপনার মনে তিক্ততার সৃষ্টি হয়।

ঘ) ধনী ব্যক্তি তার কতজন বন্ধ আছে, তা জানে না। এই কথা হিতোপদেশ ১৪ : ২০ পদের বিপরীত মনে হতে পারে। উক্ত পদটিতে বলা হয়েছে, ''দরিদ্র আপন প্রতিবেশীরও ঘৃণিত, কিন্তু ধনবানের অনেক বন্ধু আছে।'' কিন্তু প্রশ্ন—তারা কি সত্যিকারের বন্ধু? নাকি, তারা স্বার্থের কারণে বন্ধুত্বের ভান করে চলেছে?

ঙ) ধনদৌলত মানুষের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করতে পারে না (উপদেশক ২ : ৮, ১১), বরং আরো বেশি আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয় (উপদেশক ৪ : ৮; ৫ : ১০)।

চ) সবশেষে, ধনদৌলত মানুষের চরিত্রকে নষ্ট করে দেয়—তার মনে গর্বভাব আনে (হিতোপদেশ ২৮ : ১১) এবং অপরের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে (হিতোপদেশ ১৮ : ২৩; যাকোব ২ : ৫-৭)।

ম্যাথু হেনরি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ''ধনের হিব্রু শব্দটির তাৎপর্য 'গুরুভার'। ধনসম্পত্তি এক বোঝা—ধন অর্জনের পর তা তত্ত্বাবধান করার বোঝা, সেগুলি রক্ষা করার ভীতিকর বোঝা, প্রলোভনের বোঝা, দু:খ-বেদনার বোঝা, এবং সেগুলির হিসাব রাখার বোঝা।''

৮. ''এই সংসারে যারা ধনী তাদের বল তারা যেন অহংকার না করে, মায়াময় ঐশ্বর্যের উপর ভরসা না রাখে। কিন্তু তাদের বল, যিনি আমাদের ভোগের জন্য সবকিছু দেন, সেই ঈশ্বরের উপর-ভরসা রেখে তারা যেন পরসেবাব্রতী হয়, সৎকর্মের সম্পদে সমৃদ্ধ হয়, মুক্তহস্তে দান করে এবং সকলকে তাদের সমাজের ভাগীদার মনে করে। এইভাবে তারা ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ী সম্পদ সঞ্চয় করে যথার্থই জীবনের অধিকারী হবে'' (১ তীমথি ৬ : ১৭-১৯)।

এই পদগুলিতে আমাদের বলা হয়েছে. ''.....যারা ধনী তাদের বল....।'' তবু কতজন ঈশ্বরের পরিচারক এই আদেশ সম্পাদন করবেন? আমরা কতজন ধনীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তর্জনী তুলেছি? আমাদের অধিকাংশ এই পদের উপদেশটিও *শুনিনি*। তবু, আজকের মতো সম্ভবত আর কখনই এই উপদেশের এমন প্রয়োজনীয়তা আসেনি।

এই উপদেশটি প্রচার করতে হলে, প্রথমে আমাদের নিজেদেরই বাধ্য হতে হবে। বিশ্বাসের পরিবর্তে আমরা যদি দৃশ্য বস্তুর উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করি, তা হলে, অন্যদের আমরা পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় না-করার কথা বলতে পারি না। আমাদের জীবন আমাদের মুখ বন্ধ করে দেবে।

ঈশ্বর এমন মানুষদের সন্ধান করছেন যারা পরিণতির কথা না-ভেবে নির্ভয়ে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করবে। তিনি সন্ধান করছেন আমোষের মতো ব্যক্তিকে যিনি সরবে বলেছিলেন ঃ

> হে শমরিয়ার গিরিবিহারিণী বাশনের গাভী সকল, এই বাক্য শুন; তোমরা দীনহীন লোকদের প্রতি উপদ্রব করিতেছ, দরিদ্রগণকে চূর্ণ করিতেছ, এবং আপনাদের কর্তাদিগকে বলিতেছ, আনো আমরা পান করি। প্রভু পরম প্রভু আপন পবিত্রতার শপথ করিয়া বলিয়াছেন, দেখ তোমাদের উপরে এমন সময় আসিতেছে, যে সময়ে লোকে তোমাদিগকে আঁকড়া দ্বারা ও তোমাদের শেষাংশকে ধীবরের বড়শি দ্বারা টানিয়া লইয়া যাইবে। আর তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন সম্মুখস্থ ভগ্নস্থান

দিয়া বাহির হইবে এবং হর্মোণে নিক্ষিপ্ত হইবে, ইহা পরমপ্রভু বলেন''। (আমোষ ৪ : ১-৩)।

অথবা, হগয়ের মতো ব্যক্তিকে যিনি বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন ঃ

এই কি তোমাদের আপন আপন ছাদ আঁটা গৃহে বাস করিবার সময়? এই গৃহ তো উৎপন্ন রহিয়াছে। (হগয় ১ : ৪)।

অবশ্য, ভাববাদীরা জনপ্রিয় ছিলেন না। তাঁদের উপস্থিতি সামসময়িক লোকদের কাছে বিরক্তির কারণ হয়েছে। তাঁরা আর্থিক চাপ সহ্য করেছেন, সমাজ থেকে হয়েছেন নির্বাসিত। কখনো কখনো তাঁরা লাঞ্ছিত হয়েছেন, কোনোক্রমেই তাঁদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিতে না-পারলে তাঁরা নিহত হয়েছেন। তাঁদের কাছে জীবনের কোনো গুরুত্ব ছিল না। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রাণ ধারণ করার চেয়ে তাঁর সত্যের জন্য মৃত্যু বরণ করাকে তাঁরা শ্রেয়জ্ঞান করতেন।

বস্তুবাদ এবং ধনদৌলত আজকের মণ্ডলীতে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রবাহের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। বিশ্বাসীরা রাজার মতো জীবন যাপন করলে কখনো উদ্দীপনা আসতে পারে না। বিশ্বাসের জীবনে ফিরে আসার এবং জীবন উৎসর্গ করার আহ্বান কে দেবে ঈশ্বরের প্রজাদের?

কে বিশ্বাসীদের দেখাবে কীভাবে 'প্রকৃত জীবন' যাপন করতে হয় (১ তীমথি ৬ : ১৯)? ''অনন্তের আলোকে জীবন যাপন করা—আমাদের চিরন্তন আবাসের দিকে দৃষ্টি রেখে ঈশ্বরের মহিমা-বিস্তৃতির জন্য আমাদের সমস্ত সম্পত্তি ব্যবহার করাই প্রকৃত জীবন। এই, শুধু এই জীবনই আকাঙ্ক্ষিত''—সি এইচ ম্যাকিন্‌টস।

৯. ''ধনী ভ্রাতা তার দৈন্যদশার গর্ব করুক, কারণ ঘাস ফুলের মতোই সে লুপ্ত হবে। সূর্যের উদয় হলে তার প্রখম তাপে তৃণ শুকায়, ঝরে পড়ে ফুল, নষ্ট হয়ে যায় তার সৌন্দর্য। বিত্তবানও সেইভাবে বিত্ত আহরণ করতে গিয়ে লুপ্ত হয়ে যাবে'' (যাকোব ১ : ১০, ১১)।

বিত্তবানকে তার ধনসম্পদের জন্য আনন্দ করতে বলা হয়নি। কেন? কারণ ধনদৌলত ঘাসের মতো ক্ষণস্থায়ী, অথচ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার মূল্য চিরন্তন।

১০. ''হে ধনিককুল, শোন, তোমাদের যে দুর্দশা আসছে, তার জন্য রোদন ও হাহাকার কর। তোমাদের ধনসম্পদে পচন ধরেছে। তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ পোকায় কেটেছে। তোমাদের সোনা রূপায় কলঙ্ক লেগেছে। সেই কলঙ্কই তোমাদের বিরুদ্ধে যাবে। আগুনের মতো তোমাদের গ্রাস করবে। এই অন্তিমকাল তোমরা সঞ্চয় করেছ। কিন্তু দেখ, তোমাদের ক্ষেতের ফসল যারা কেটেছে তাদের যে মজুরি তোমরা জোচ্চুরি করে দাওনি, তা এখন আর্তনাদ করছে। ক্ষেতমজুরদের সেই কাতর ক্রন্দন বাহিনীপতি

প্রভুর কানে পৌঁচেছে। তোমরা ইহজীবন ভোগবিলাসে ও ইন্দ্রিয়-সেবায় কাটিয়েছ। তোমরা বলির পশু মতো নিজেদের হৃষ্টপুষ্ট করে তুলেছ। সেই বলির দিন এখন সমাগত। তোমরা ধার্মিককে দোষী সাব্যস্ত করে খুন করেছ, সে তোমাদের বাধা দেয়নি" (যাকোব ৫ : ১-৬)।

এখানে ঈশ্বরের আত্মা ধনসঞ্চয়ের বিরুদ্ধে (৩ পদ), মজুরি না-দেওয়ার বিরুদ্ধে (৪ পদ), বিলাসবহুল জীবনযাপনের বিরুদ্ধে (৫ পদ), অসহায়, প্রতিরোধহীন, নির্দোষ মানুষদের কাছ থেকে অন্যায় সুযোগ (৬ পদ) গ্রহণ করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে।

এই পদগুলি বিশ্বাসী, না অবিশ্বাসীদের উদ্দেশে লিখিত হয়েছিল, সে তর্কবিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। জুতো যদি পায়ের মাপসই হয়, তা হলে তা পায়ে দেওয়াই সঙ্গত।

১১. "তুমি বলে থাক আমি ধনী, সমৃদ্ধশালী, আমার কোন অভাব নেই। কিন্তু তুমি জান না যে তুমি কত হতভাগ্য, কৃপার পাত্র, দরিদ্র, অন্ধ এবং উলঙ্গ। এইজন্যই আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি আমার কাছ থেকে এই জিনিসগুলো কিনে নাও—অগ্নিশুদ্ধ কাঞ্চন, যেন ধনী হতে পার, শুভ্র বসন, যার দ্বারা তোমার নগ্নতার লজ্জা হবে আবৃত, এবং কাজল, যা চোখে লাগালে তুমি দেখতে পাবে। আমি যাদের ভালোবাসি তাদের শাসন ও সংশোধন করি। সুতরাং সচেষ্ট হও, হৃদয় পরিবর্তন কর" (প্রকাশিত বাক্য ৩ : ১৭-১৯)।

মণ্ডলীর কাছে, লায়দেকিয়া মণ্ডলীর উদ্দেশে প্রভুর শেষ উপদেশ। এগুলির ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। বাক্যগুলির অর্থ আমরা জানি। আমরা জানি, বাক্যগুলি আমাদের কাছে বিশেষ অর্থবহ। এবং এগুলি পালন করা আমাদের জীবনে প্রয়োজন।

অলসদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী!

সব সময় একটা বিপদ থেকেই যায় যে, এই রকম রচনাকে কেউ কেউ তাদের শ্রমবিমুখতার অজুহাত রূপে কাজে লাগাতে পারে। এ পাঠ করার পর শ্রমবিমুখ মানুষ বলতে পারে, "আমি সব সময় এ রকমই বিশ্বাস করি।"

যারা অ-পারদর্শী, অথবা যারা মনে করে, তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য জগৎ (অথবা মণ্ডলী) দায়বদ্ধ, এ উপদেশ তাদের জন্য নয়। এই প্রকারের লোকদের জন্য ঈশ্বরের উপদেশ ভিন্নতর ঃ "বিছানা ছেড়ে উঠে কাজে বেরিয়ে পড়ো" (২ থেসা. ৩ : ৬-১২ দেখুন)।

এই উপদেশ তাদেরই জন্য, যারা আন্তরিক, পরিশ্রমী, শ্রমমুখী, পরিবারের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যারা কাজ করে, যারা প্রভু যীশুর জন্য জীবন যাপন করে, তারা ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে পারে।

বিচার করার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

আর একটি বিপদ আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে। ধনদৌলতের অধিকারী হওয়ার জন্য ব্যক্তিবিশেষকে অপরাধী সাব্যস্ত করার এক বিপজ্জনক প্রবণতা আছে আমাদের মধ্যে। আমরা অন্যের বিচার করব না বা তাদের ঈশ্বর-অনুরক্তি নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করব না।

ধনসম্পদ সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্যের নীতি কি— তা প্রচার করা এক কথা, আর কোনো খ্রীস্টান পরিবারে গিয়ে তার সঞ্চিত সম্পদ নিয়ে তাৎক্ষণিক তথ্যানুসন্ধান করা ও তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা অন্য কথা।

ঈশ্বরের বাক্য কী বলছে, তা শোনার ও সেই অনুযায়ী নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করার জন্য আমরা দায়বদ্ধ। একক ব্যক্তির পরিবারে যে অর্থের প্রয়োজন, কোনো বৃহৎ পরিবারে যে তার চেয়ে বেশি অর্থের প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য।

কোনো ব্যক্তি-বিশেষের জীবনে ঈশ্বরের আজ্ঞার বাধ্য হওয়ার অর্থ কী, সে বিষয়ে তাকে আমরা উপদেশ দিতে পারি না। ধনাধ্যক্ষ রূপে আমাদের প্রত্যেককে ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে, অপরের জন্য আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

তাই অপরের ছিদ্রান্বেষণ করার মানসিকতা থেকে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।

উপসংহার

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে, বিশ্বাসীরা খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে; তাদের পরিবারের চলতি প্রয়োজন মেটাবার জন্য পরিশ্রমী হবে; এবং উদ্বৃত্ত সবকিছু ঈশ্বরের কার্যক্ষেত্রে প্রেরিত হবে। তারা ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য অর্থ সঞ্চয় না করে এ জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করবে। প্রভু যীশুখ্রীস্টের সেবাই হবে তাদের জীবনের পরম লক্ষ্য; আর অন্য সব কিছুই স্থান পাবে এর নিচে।

এই জীবনের বিষয়েই সুসমাচারে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, প্রেরিতদের বিবরণীতে অনুশীলিত হয়েছে এবং পত্রাবলিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে। স্বয়ং প্রভু যীশু এর চূড়ান্ত উদাহরণ।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, ‘‘আমার নিজের জীবনে একে আমি কীভাবে বাস্তব করে তুলব? আমার কী করা উচিত?’’

১. সর্বপ্রথম, আমরা প্রভু যীশুর কাছে সমর্পিত হব (২ করি. ৮ : ৫)। আমরা যখন তাঁর হই, সুনিশ্চিতভাবে আমাদের সম্পত্তিও হয় তাঁর।

২. এর পর, প্রভু যখন আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অঙ্গুলি স্পর্শ করেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তাতে সাড়া দেওয়া উচিত। হয়তো হোটেলে মহার্ঘ খাদ্যভোজনের জন্য তিনি আমাদের মনে অস্বস্তিভাব সৃষ্টি করলেন। অথবা দামি দামি

খেলার সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য আমাদের সচেতন করলেন। যখন সর্বাধুনিক মডেলের অত্যন্ত দামি গাড়ি আমাদের চোখে পড়ে, তিনি আমাদের আরও কম দামি ভালো গাড়ি দেখিয়ে দিতে পারেন এবং এই বাবদ উদ্বৃত্ত অর্থ সুসমাচার প্রচারের কাজে প্রেরণ করার কথা বলতে পারেন। তিনি আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদেও 'বিপ্লব' ঘটাতে পারেন, যাতে আমরা সেই অর্থে আরও অনেককেই ঈশ্বরের ধার্মিকতা বস্ত্র পরিধান করাতে পারি। মহার্ঘ বাড়ি না-কিনে আমরা হয়তো কম-দামের কোয়ার্টারে বাস করতে পারি।

এই সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বর যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন, আমরা তা জানতে পারব। এ এত স্বচ্ছ যে, প্রত্যাখ্যানের অর্থ হবে সরাসরি অবাধ্যতা।

৩. তৃতীয় বিষয়, "তিনি তোমাদের যা বলেন, তা-ই কর" (যোহন ২ : ৫)। বন্ধু-বান্ধব আপনাকে ভুল বুঝতে পারে। আত্মীয়-স্বজন আপনাকে তিরস্কার করতে পারে। নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। শুধু যীশুকে অনুসরণ করুন, এবং সমস্ত পরিণতি অর্পণ করুন তাঁর উপর।

৪. ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করার জন্য সবকিছুকে বর্তমান প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে স্থাপন করুন। নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করুন। আপনি কোথায় অর্থ প্রেরণ করবেন, তা তাঁকে দেখিয়ে দিতে বলুন। তিনি আপনাকে পথ দেখাবেন।

এই ধরনের খ্রীস্টীয় অনুরাগের ফলাফল দেখার সুযোগ ঈশ্বর যেন আমাদের এবং আমাদের বর্তমান প্রজন্মের জীবনে দান করেন। জন্ ওয়েস্‌লি এক সময় প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

যার জন্য আমি আকাঙ্ক্ষিত, ঈশ্বর আমাকে সেই জিনিসটি দিন। এখান থেকে চলে যাবার পূর্বে, যখন আমাকে আর দেখা যাবে না, আমি যেন ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ সমর্পিত একদল মানুষকে দেখতে পাই, যারা জগতের কাছে ক্রুশবিদ্ধ এবং জগৎ যাদের কাছে ক্রুশবিদ্ধ। এমন একদল মানুষ যারা তাদের দেহ-প্রাণ-আত্মা সবকিছুই সমর্পণ করেছে। তখন কত উল্লাসভরে আমি বলব, "এখন তোমার দাসকে শান্তিতে প্রস্থান করতে দাও।"

প্রভু, চূর্ণ কর আমায়!

“আত্মার ভগ্নতা যা পিতার পরাক্রমের প্রতিরোধ করে না, তা-ই আত্মার উর্বরতার প্রধান উপাদান—পিতা এই আত্মাতেই কাজ করেন। তিনি আমাদের কাছ থেকে ক্ষমতার সন্ধান করছেন না। তিনি চান, আমাদের দুর্বলতা। তিনি প্রতিরোধী শক্তির সন্ধান করছেন না, তিনি চান তাঁর কাছে আমাদের ‘সমর্পিত’ জীবন। সকল পরাক্রম তাঁরই। তাঁর শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধ হয়।”

—সংগৃহীত

ভূমিকা

তিরিশ বছর পরে অ্যাণ্ড্রু ম্যুরে তাঁর 'খ্রীস্টে সংস্থিত' পুস্তকে লিখেছিলেন ঃ

> আমি জানাতে চাই যে, পরিচারক বা ক্রীশ্চান লেখক নিজে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেননি, তা প্রায়ই বলে থাকেন। আমি সেই সময় (যখন তিনি এই পুস্তকটি রচনা করেন) যা লিখেছিলাম, সব অভিজ্ঞতা তখন আমি লাভ করিনি। আমি এ কথাও বলতে পারি না যে, এখন আমি সেই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে লাভ করেছি।

এই একই সাহসিকতায় পৌল লিখেছিলেন ঃ

> আমি যা চাই তা সব এখনও পাইনি, আমি এখনও সিদ্ধি লাভ করিনি। তবে আমি জয়ের পথে এগিয়ে চলেছি। খ্রীস্ট যীশু সেই জন্যই তো আমাকে জয় করে নিয়েছেন। (ফিলিপীয় ৩ : ১২)।

বর্তমান **'প্রভু, চূর্ণ কর আমায়!'** রচনা প্রসঙ্গে আমার এই একই অনুভূতি আমি আপনাদের কাছে প্রকাশ করতে চাই। এই সমস্ত বিষয় লেখার জন্য প্রভু আমাকে ভারগ্রস্ত করেছেন। এই সত্যের পূর্ণ অবিজ্ঞতা লাভ করতে আমি ব্যর্থ হয়েছি—শুধু এই কারণে সত্যকে ধরে রাখতে হবে। আমি যতদূর পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছি, আমার রচনার মধ্য দিয়ে সেই বিষয়গুলিকে আমি আমার হৃদয়ের ব্যাকুল বাসনা করে তুলেছি।

—উইলিঅম ম্যাকডোনাল্ড

ঈশ্বর ভগ্ন জিনিসের মূল্য দিয়ে থাকেন

কোনো জিনিস ভেঙে গেলে তার মূল্য হ্রাস পায়। ভাঙা পাত্র, ভাঙা বোতল, ভাঙা আয়না সাধারণত ফেলে দেওয়া হয়। এমন-কী, আসবাবপত্রে চিড় ধরলে বা কাপড় ছিঁড়ে গেলে বিক্রি করার সময় দাম কমে যায়।

কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সেভাবে হয় না। ঈশ্বর ভগ্ন জিনিসের—বিশেষত ভগ্নচিত্ত মানুষের মূল্য দিয়ে থাকেন। সেইজন্যই আমরা এই ধরনের পদগুলি দেখতে পাই ঃ

> প্রভু ভগ্নহৃদয় ব্যক্তিদের কাছেই থাকেন, তাদের আত্মা নিষ্পেষিত, তাদের উদ্ধার করেন তিনি (গীতসংহিতা ৩৪ : ১৮)।
>
> চূর্ণিত হৃদয়ই ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি, হে ঈশ্বর, ভগ্ন ও চূর্ণ হৃদয় তুমি অবজ্ঞা করবে না (গীতসংহিতা ৫১ : ১৭)।

ঈশ্বর জানেন, গর্বিত ও উদ্ধত ব্যক্তিদের কেমনভাবে প্রতিরোধ করতে হয়, কিন্তু নম্র ও অনুতপ্ত ব্যক্তিদের তিনি প্রতিরোধ করতে পারেন না।

ঈশ্বর গর্বিতদের বাধা দান করেন, কিন্তু নম্রদের দেন অনুগ্রহ (যাকোব ৪ : ৬)। আমাদের ভগ্নতার মধ্যে এমন কিছু থাকে যা তাঁর অনুকম্পা ও শক্তি দাবি করে।

তাই আমাদের জীবনের জন্য তাঁর বিস্ময়কর উদ্দেশ্য—আমরা হব ভগ্ন—হৃদয়ে ভগ্ন, আত্মায় ভগ্ন, এবং দেহেও ভগ্ন (২ করি. ৪ : ৬-১৮)।

মন-পরিবর্তন এক প্রকারের ভগ্নতা

মন-পরিবর্তনের পূর্বে ভগ্নতার প্রণালী কাজ করে বলে পাপ সম্পর্কে আমাদের সচেতন করার জন্য পবিত্র আত্মা তাঁর কাজ শুরু করে দেন। তিনি আমাদের এমন একটি স্থানে নিয়ে আসতে চান, যেখানে আমরা স্বেচ্ছায় স্বীকার করব যে, আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে হারিয়ে গেছি, আমরা অযোগ্য, শুধু নরকেরই যোগ্য। চলার প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা সংগ্রাম করে চলি। যতক্ষণ না আমাদের গর্ব চূর্ণ হয়, আমাদের উদ্ধত বাক্য স্তব্ধ হয় এবং সকল প্রতিরোধ বিলীন হয়, তিনি আমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেন। ক্রুশের তলদেশে এসে শেষ পর্যন্ত আমরা বলি, "প্রভু যীশু, আমাকে রক্ষা কর।" কুপ্রকৃতি বশ্যতা স্বীকার করেছে, পাপী পরাজয় স্বীকার করেছে, অশ্ব ভগ্নচূর্ণ হয়েছে।

হ্যাঁ, অশ্ব ভগ্নচূর্ণ হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে অশ্ব বন্য স্বভাবের, অ-বশ্য প্রাণী। তাকে জিন বা বল্‌গা পরাতে গেলে লম্ফঝম্প করে, লাথি ছোড়ে। অশ্ব দেখতে সুন্দর, সুঠাম তার দেহ, কিন্তু যতক্ষণ না সে ভগ্নচূর্ণ হচ্ছে, সে কোনো কাজেই লাগে না।

যতক্ষণ না অশ্ব তার সাজপোশাকে সজ্জিত হতে রাজি হচ্ছে, ততক্ষণ বেদনাদায়ক, এক দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি চলতেই থাকে। অশ্বের ইচ্ছা যখন উচ্চতর ইচ্ছার দ্বারা পরাজিত হয়, তখনই পশুটির উপযোগিতা বোঝা যায়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, প্রভু যীশু ছিলেন নাজারেথের এক ছুতোর। তিনি হয়তো কাঠের জোয়াল তৈরি করতেন। কোনো একজন বলেছেন, তাঁর দোকানের মাথার উপর যদি সাইনবোর্ড থাকত, তা হলে হয়তো সেখানে লেখা থাকত, ''আমার জোয়াল মানানসই।'' কিন্তু লক্ষণীয় যে, আমাদের দিব্য প্রভু এখনও জোয়াল নির্মাতা। তিনি বলেন,

> আমার জোয়াল তোমরা কাঁধে তুলে নাও, আমার কাছেই শিক্ষা নাও, কারণ আমি নম্র ও বিনীত। তা হলে তোমরা স্বস্তি পাবে জীবনে। আমার জোয়াল সুবহ, আমার দেওয়া ভারও লঘু। (মথি ১১ : ২৯, ৩০)।

যারা ভগ্নচূর্ণ ও অবনত, জোয়াল শুধু তাদেরই জন্য। আমাদের ইচ্ছাকে দমন করতে হবে এবং তাঁর সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করার আগে সমর্পিত হতে হবে। তিনি ছিলেন নম্র ও মৃদুচিত্ত। আমাদেরও তাঁর মতো হতে হবে এবং শুধু এরই মাধ্যমে আমরা অন্তরের বিশ্রাম খুঁজে পাব।

ভগ্নতার উপাদান

কিন্তু একটি মূল প্রশ্ন উত্থিত হয়, ''প্রকৃত ভগ্নতার অর্থ কী? বিশ্বাসীর জীবনে তা কীভাবে প্রকাশিত হয়? এর কয়েকটি মৌলিক উপাদান কী?''

১. *অনুতাপ, স্বীকার, ক্ষমাভিক্ষা*

হয়তো অন্যতম বিষয় হিসাবে আমরা প্রথমেই ঈশ্বরের কাছে পাপস্বীকার এবং যাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করেছি, তাদের কাছে অপরাধ স্বীকারের কথা চিন্তা করতে পারি। ভগ্নচিত্ত মানুষ অনুতাপ করতে বিলম্ব করে না। সে পাপ লুকিয়ে রাখতে চায় না। সে এই অজুহাত দিয়ে পাপকে ভুলে থাকতে চায় না, ''সময়ই সবকিছু ঠিক করে দেবে''। সে কালবিলম্ব না করে ঈশ্বরের কাছে ছুটে আসে এবং চিৎকার করে বলে, ''আমি পাপ করেছি।'' এর পর তার ব্যবহারের দ্বারা যাকে আঘাত করেছে, তার কাছে গিয়ে বলে, ''আমি ভুল করেছি, আমি দু:খিত। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।'' ক্ষমা ভিক্ষা করার জন্য একদিকে সে যেমন প্রচণ্ড লজ্জা বোধ করে, অন্যদিকে তেমনই সে জানে, তার বিবেক হবে স্বচ্ছ এবং আলোর পথে পারবে চলতে।

প্রকৃত পাপস্বীকার পাপের পক্ষে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে না বা এর

বাস্তবতাকে ভোঁতা করে দেয় না। পাপস্বীকার সেই অভগ্নচিত্ত নারীর মতো বলে না, যে বলেছিল, “আমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি, আমি ক্ষমা চাইতে রাজি”। প্রকৃত পাপস্বীকার বলে, “আমি অন্যায় করেছি; আমি আমার দু:খ প্রকাশ করার জন্য এসেছি।”

দাউদের জীবনে পাপ এবং ব্যর্থতা ছায়াবিস্তার করেছিল। কিন্তু তাঁর গভীর প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে তিনি আবার ঈশ্বরের হৃদয়ের কাছাকাছি এসেছিলেন। গীতসংহিতার ৩২ ও ৫১ সংখ্যক গীতে আমরা তাঁর পাপ ও অপরাধের জন্য আর্তি শুনতে পাই। তিনি যখন অনুতাপ করতে অস্বীকার করেছিলেন, সেই সময়কার তাঁর অবস্থা আমরা লক্ষ করি—তাঁর দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক অবস্থায় দুর্দশা নেমে এসেছিল। কোনো কিছুই সঠিক পথে চলছিল না। দেখে মনে হচ্ছিল, সব কিছুই যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছে। শেষে তিনি ভেঙে পড়লেন। তিনি স্বীকার করলেন, ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করলেন। আবার সবকিছু পূর্বাবস্থায় ফিরে এল, দাউদ আবার সংগীতমুখর হলেন।

নতুন নিয়মে পৌল ভগ্নতার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সেই সময় তিনি প্রধান যাজক ও সর্বোচ্চ বিচার পরিষদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি সারা জীবন নিখুঁতভাবে কাটিয়েছেন এবং ঈশ্বরের সামনে তাঁর বিবেক নির্মল—তাঁর এই মন্তব্য শুনে প্রধান যাজক ক্ষিপ্ত হয়ে বন্দির মুখে চড় মারার আদেশ দিলেন। পৌল তখন তাঁকে বললেন, “ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করবেন! তুমি চুনকাম করা দেওয়াল! আইনগতভাবে তুমি আমার বিচার করতে বসেছ, অথচ আইন-বিরুদ্ধভাবে আমাকে চড় মারার আদেশ দিচ্ছ?” (প্রেরিত ২৩ : ৩)। যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, পৌলের এই তিরস্কারে তারা আহত হল। পৌল কি জানতেন না যে, তিনি প্রধান যাজকের সঙ্গে কথা বলছেন? প্রকৃতপক্ষে, পৌল তা জানতেন না। হয়তো অননিয় তাঁর যাজকের পোশাক পরিধান করেননি অথবা তাঁর নির্ধারিত আসনে বসেননি। অথবা হয়তো পৌলের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ থাকাই এর কারণ। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আইনসংগতভাবে নির্বাচিত একজন অধ্যক্ষকে রূঢ় বাক্য বলেননি। তাই তিনি দ্বিতীয় বিবরণ ২২ : ২৮ পদটি উদ্ধৃত করে তাঁর উক্তির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করলেন ঃ “আমি জানতাম না যে, উনি প্রধান পুরোহিত। কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে, তোমার সজাতির কোনো কর্তৃপক্ষকে কটু কথা বোলো না।’ ” ‘আমি ভুল করেছি, আমি দু:খিত’—এ কথার মধ্য দিয়ে পৌল তাঁর অধ্যাত্মজীবনের পরিপক্বতাকে প্রকাশ করলেন।

২. *ক্ষতিপূরণ*

ভগ্নতার প্রথম বিষয়টির সঙ্গে ক্ষতিপূরণ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। যদি আমি চুরি করে থাকি, কোনো জিনিসের ক্ষতি করে থাকি অথবা আমার অসদাচরণের ফলে কারো যদি ক্ষতি হয়ে থাকে, সেজন্য শুধু ক্ষমা ভিক্ষা করাই যথেষ্ট নয়। ন্যায়বিচার

করতে হলে তার ক্ষতি পূরণ করতে হবে। মন-পরিবর্তনের পূর্বে বা পরে, যে-কোনো সময়ের ক্ষতিপূরণের জন্য একই কাজ করতে হবে।

সখরিয় যীশুকে গ্রহণ করার পর, তার মনে পড়ল, কর-আদায়কারী থাকা অবস্থায় সে অনেকেরই সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। ঈশ্বর তার মনে চেতনা দিলেন, সেই সমস্ত দুষ্কর্মগুলি তখনই প্রতিকার করতে হবে। সে তাই প্রভুকে বলল, "....যদি অন্যায় করে কারও কিছু নিয়ে থাকি, তবে তার চারগুণ ফিরিয়ে দিই।" এখানে "যদি" শব্দটির মধ্যে সন্দেহ বা দ্বিধা নেই। এর অর্থ, "যার প্রতি বা যে বিষয়ে আমি অন্যায় করেছি, তার প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমি চারগুণ ফিরিয়ে দেব।" ক্ষতি পুরণের জন্য তার এই সিদ্ধান্ত-গ্রহণ তার মন-পরিবর্তনেরই ফল।

এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়। হয় তো রেকর্ড নষ্ট হয়ে গেছে, অথবা সময়ের ব্যবধানে অর্থের সঠিক পরিমাণ ভুলে গেছেন। এর সবকিছুই ঈশ্বর জানেন। তিনি চান, যতদূর সম্ভব প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা যেন ক্ষতি পূরণ করি।

এই ক্ষতিপূরণ সর্বদা প্রভু যীশুর নামে করতে হবে। "আমি এটা চুরি করেছিলাম। আমি দুঃখিত। এখন আমি তোমাকে এটা ফেরত দিচ্ছি"—শুধু এ কথা বললে এই বলার মধ্যে ঈশ্বরের কোনো গৌরব নেই। এই কাজের দ্বারা আমরা যেন প্রভু যীশুর সাক্ষ্য দিই। আমরা এইভাবে বলব, "প্রভু যীশু খ্রীস্টকে বিশ্বাস করে আমি সম্প্রতি খ্রীশ্চান হয়েছি। পাঁচ বছর আগে আপনার কাছ থেকে আমি কিছু যন্ত্রপাতি চুরি করেছিলাম। প্রভু আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে ও যন্ত্রপাতি ফেরত দিতে এসেছি।" খ্রীস্টবিশ্বাসীর প্রত্যেকটি ধার্মিকতার বা দয়ার কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হবে পরিত্রাতার পক্ষে সাক্ষ্য, যেন খ্রীস্টবিশ্বাসী নয়, ঈশ্বর হন মহিমান্বিত।

৩. *ক্ষমাশীল আত্মা*

ভগ্নতার তৃতীয় উপাদান—যখন আমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়, তখন আমাদের মধ্যে ক্ষমা করার সদিচ্ছা থাকবে। বহু ক্ষেত্রে, ক্ষমা ভিক্ষা বা ক্ষতি পূরণ করার মতোই ক্ষমাশীলতা অনুগ্রহ নিয়ে আসে।

প্রকৃত পক্ষে, নতুন নিয়মে অপরকে ক্ষমা করার বিষয়ে খুব স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

প্রথমত, আমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হলে, অন্যায়কারীকে আমরা ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত থাকব (ইফিসীয় ৪ : ৩২)। আমরা হয়তো তার কাছে যাব না বা বলব না যে, তাকে ক্ষমা করেছি, কিন্তু আমাদের হৃদয় থেকে তাকে আমরা ক্ষমা করেছি।

যে মুহূর্তে কোনো মানুষ আমার প্রতি অন্যায় আচরণ করে, আমি তাকে অবশ্যই

> মানুষ রূপেই দেখি, তা হলে আমি ঈশ্বরের ও তার বিরুদ্ধে পাপ করি। সেই ব্যক্তি অনুতপ্ত বা আমার ক্ষমাপ্রার্থী কি না, তাতে কিছুই আসে যায় না। আমি তখনই তাকে ক্ষমা করেছি। সে যে অন্যায় করেছে, সেই অন্যায়ের জন্য সে ঈশ্বরের মুখোমুখি হবে; সেটা ঈশ্বরের সঙ্গে তার বোঝাপড়া, আমার নয়। মথি ১৮ : ১৫ পদ অনুযায়ী আমি তাকে সাহায্য করব। আমার এই প্রচেষ্টা সফল হোক বা না-হোক, আমি তাকে ক্ষমা করব"। —(লেনস্‌কি)

ছোটোখাটো অসংখ্য ভুলভ্রান্তি রয়েছে—সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া যায়। যখন আমরা তা করতে পারি, তখনই তা প্রকৃত জয়। "প্রেম কারও অধর্মাচরণে আনন্দ লাভ করে না...." (১ করি. ১৩ : ৬)। একবার এক খ্রীশ্চান মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "ওই হিংসুটে মহিলাটি আপনার সম্পর্কে কী নোংরা কথা বলেছিল, মনে আছে?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি শুধু মনেই রাখিনি, আমি স্পষ্টভাবে মনে রেখেছি যে, আমি তাঁকে ক্ষমা করেছি।"

আপনি যদি মনে করেন, অপরাধটি ভয়ঙ্কর প্রকৃতির, এবং একে এড়িয়ে যাওয়া ধর্মসম্মত হবে না, তা হলে অপরাধীর কাছে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলুন (মথি ১৮ : ১৫)। সে অনুতপ্ত হলে, তাকে ক্ষমা করুন। "যদি সে তোমার কাছে দিনের মধ্যে সাতবার অপরাধ করে এবং যদি বলে, 'আমি অনুতপ্ত'—অবশ্যই তাকে ক্ষমা কোরো" (লুক ১৭ : ৪)। অপরকে অসংখ্যবার ক্ষমা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। সর্বোপরি, আমরা অগণিত বার ক্ষমা পেয়েছি এবং পাচ্ছি।

মনে রাখবেন, আপনি অন্য কারো কাছে গিয়ে দোষী ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কে বলবেন না (যেটা আমরা অবশ্যম্ভাবী রূপে করে থাকি)। আপনি এবং সে যখন একা থাকবেন, তার কাছে গিয়ে তার অপরাধের কথা বলুন।

দোষী ব্যক্তি যখন তার পাপ স্বীকার করে, আপনি তাকে বলুন যে, আপনি তাকে ক্ষমা করেছেন। আপনার অন্তর থেকে আপনি ইতিমধ্যেই তাকে ক্ষমা করেছেন, এখন তার প্রতি আপনার ক্ষমার মনোভাব প্রকাশ করতে পারেন।

কিন্তু মনে করুন, সে অনুতাপ করতে অস্বীকার করল। তখন মথি ১৮ : ১৬ পদ অনুসারে আপনি আরও দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে যান, যেন দু'জন বা তিনজনের সাক্ষাতে সব ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

দুই বা তিনজন সাক্ষীর কথা শুনতে সে যদি রাজি না হয়, তা হলে বিষয়টি স্থানীয় বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় আনীত হবে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ বা শাস্তি প্রদান করা এর উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য দোষী ভাইয়ের পরিবর্তন ঘটানো।

এই শেষ চেষ্টা যদি বিফল হয়, তাকে অইহুদি বা কর-আদায়কারী রূপে গণনা করা হবে। অন্য ভাষায় বলা যায়, আপনি তাকে আর স্থানীয় সহভাগিতার অংশীদার

রূপে মনে করবেন না, আপনি তাকে এক অবিশ্বাসীর মতো গণ্য করবেন। কিন্তু যখনই সে অনুতাপ করবে, আপনি তাকে ক্ষমা করবেন এবং আবার পূর্ণ সহভাগিতা গড়ে উঠবে।

ঈশ্বর ক্ষমাহীন অন্তরকে ঘৃণা করেন। যারা প্রতিহিংসাপরায়ণ, যারা অতীত ঘটনাকে অতীত বলে মনে করে না, ঈশ্বর তাদের ঘৃণা করেন। মথি ১৮ : ২৩-৩৫ পদে এক ঋণী পরিচারকের দৃষ্টান্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যখন সে নিজে ছিল নিঃস্ব, রাজা তার বিপুল পরিমাণ ঋণ মকুব করেছিলেন। কিন্তু কয়েকটি টাকার জন্য সে তার সহ-দাসকে ক্ষমা করতে চাইল না। এখানে শিক্ষণীয় বিষয়টির মধ্যে কোনো আলো-আঁধারি নেই। আমাদের আকণ্ঠ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেছেন, তাই আমাদের কাছে যৎসামান্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের আমরা ক্ষমা করব।

৪. *প্রতিহিংসার মনোভাব না-নিয়ে অন্যায় সহ্য করা*

ভগ্নতার আরও কয়েকটি দিক আছে। তার একটি, ভগ্নচিত্ত ব্যক্তি ভালো কাজের জন্য নিগ্রহ ভোগ করে এবং প্রতিহিংসা গ্রহণ করে না। এই ক্ষেত্রে, অবশ্যই, আমাদের প্রভু চূড়ান্ত নিদর্শন,

> তিনি বিদ্রূপের প্রতিবাদে বিদ্রূপ করেননি। নির্যাতিত হয়ে শাপ-শাপান্ত করেননি, কিন্তু ন্যায় বিচারক ঈশ্বরের হাতে বিচারের ভার অর্পণ করেছেন।
>
> (১ পিতর ২ : ২৩)

আমরা প্রত্যেকেই এই ধরনের জীবন যাপনের জন্য আহূত হয়েছি।

> ঈশ্বরকে স্মরণ করে কেউ যদি অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে তবে তার পক্ষে প্রশংসনীয়। অন্যায় করে যদি মার খাও তবে সেই মার সহ্য করায় কীসের কৃতিত্ব? বরং ভালো কাজের জন্য যদি দুঃখ পাও এবং তা মেনে নাও তবে তা-ই হবে ঈশ্বরের কাছে সন্তোষজনক।
>
> (১ পিতর ২ : ১৯, ২০)

মারডক ক্যাম্পবেল তাঁর একটি পুস্তকে (From Grace to Glory) আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, জন্ ওয়েসলির এমন এক স্ত্রী ছিল যে তাঁর জীবনকে অগ্নিকুণ্ড করে তুলেছিল। সেই মহিলা বেশ কয়েক ঘন্টা জন্ ওয়েসলিকে আক্ষরিকভাবেই মাথার চুল ধরে মেঝের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে টানা হ্যাঁচড়া করত। মেথোডিস্ট মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা তার বিরুদ্ধে কখনো একটি রূঢ় বাক্য উচ্চারণ করেননি।

ক্যাম্পবেল আরও একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন, "এক ঈশ্বরভক্ত পরিচারক একই ধরনের এক মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। একদিন তিনি ঘরে বসে বাইবেল পাঠ করছেন। দরজা খুলে গেল, তার স্ত্রী প্রবেশ করল। সে তাঁর হাত থেকে বাইবেলটা

কেড়ে নিয়ে আগুনে ফেলে দিল। পরিচারক মহাশয় তাঁর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে একটি কথা বললেন, 'আমি কখনো বেশি উত্তপ্ত আগুনের সামনে বসি না।' এই উত্তরে তাঁর স্ত্রীর ক্রোধ প্রশমিত হল এবং তার এক নতুন মহিমময় জীবন শুরু হল। তাঁর ঈযেবেল স্ত্রী হল লিডিয়া। কন্টক রূপান্তরিত হল লিলি পুষ্পে।''

> এক ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি বলেছিলেন, ''বিনা কারণে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েও নিরুত্তর থাকাই সবচেয়ে প্রগাঢ় ও প্রকৃত নম্রতার চিহ্ন। অপমান ও অন্যায়ের সময় নীরব থেকে আমরা প্রভু যীশুর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করতে পারি। 'হে আমার প্রভু, যখন আমি স্মরণ করি, কতভাবে তুমি বিনা কারণে দু:খভোগ করেছ, আমি জানি না, আমি যখন নিজের সমর্থনের জন্য অজুহাত দেখাই, তখন আমার চেতনা কোথায় থাকে। তোমার বিরুদ্ধে লোকে কত কথা ভেবেছে এবং দুর্ব্যবহার করেছে, আমি কী করে আশা করতে পারি যে, লোকে আমার সম্পর্কে ভালো কথা ভাববে এবং বলবে?'' (*Living Patiently*, J. Allen Blair, pp. 353, 4)

৫. উত্তমের দ্বারা মন্দকে জয় করা

ভগ্নতার জীবনে আর একটি অতিরিক্ত গুণ—অন্যায়কে শুধু ধৈর্য ধরে সহ্য করতে হবে তা-ই নয়, অন্যায়ের পরিবর্তে দয়া প্রদর্শন করতে হবে।

> অনিষ্টের প্রতিশোধে অনিষ্ট কোরো না। সকলের বিচারে যা ভাল মনে হবে তাই করার চেষ্টা কর। ....তোমার শত্রু ক্ষুধার্ত হলে তাকে খেতে দাও, তৃষ্ণার্ত হলে তাকে জল দাও—তা হলে তোমার শত্রু মরমে মরে যাবে, মন্দের কাছে হার স্বীকার কোরো না, সৎ আচরণ দ্বারা অসৎকে জয় কর (রোমীয় ১২:১৭, ২০, ২১)।

একটি হাতীর কাহিনী আমার সব সময় মনে পড়ে। একটি হাতীকে তার মালিক রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। লোকটির হাতে লোহার তৈরি একটি তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ। শ্লথগতি হাতীটি যাতে অন্য দিকে চলে না যায়, সেজন্য অঙ্কুশটিকে সে ব্যবহার করছিল। এর পর মালিকের হাত থেকে অঙ্কুশটা সশব্দে রাস্তার উপর পড়ে গেল। দীর্ঘক্ষণ ধরে যন্ত্রণাভোগকারী হাতীটি ঘুরে দাঁড়িয়ে তার শুঁড় দিয়ে অঙ্কুশটা তুলে তার মালিকের হাতে তুলে দিল। হাতীরা যদি খ্রীশ্চান হত, এই হাতীটি অবশ্যই তাদের মধ্যে একজন।

৬. নিজের চেয়েও অন্যকে সম্মান দেওয়া

ভগ্নতার আর একটি দিক—নিজের চেয়ে অন্যকে বেশি মর্যাদা দিতে হবে (ফিলিপীয় ২:৩)। অব্রাহামের জীবনের একটি ঘটনায় আমরা এর উদাহরণ দেখতে

পাই (আদি পুস্তক ১৩ : ১-১৩)। তিনি এবং লোট মিশর থেকে এসে নাগেবে এসেছেন, এবং তার পর তাঁদের পরিজন ও সম্পত্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন বেথেলে। তাঁদের দুজনেরই ছিল প্রচুর পশুধন এবং চারণভূমি নিয়ে তাঁদের লোকদের মধ্যে বিবাদ লেগে গেল। এই রকম সময়ে অব্রাহাম ঘটনায় হস্তক্ষেপ করলেন। তিনি লোটকে বললেন, "দেখ, সামান্য বিষয় নিয়ে আমরা বিবাদ করছি। তুমি যে চারণভূমি চাও, নাও; আমার পশুপাল নিয়ে আমি অন্য কোথাও যাব।" তাই লোট জর্ডন উপত্যকায়—সদোমের কাছাকাছি একটা সুন্দর চারণভূমি পছন্দ করল। বৃহৎ-হৃদয়ের অব্রাহাম কনানের দিকে গেলেন। তাই পুরাতন নিয়মের এই সাধু ব্যক্তিটি অপরকে শ্রেয়জ্ঞান করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন, যা পৌল তাঁর রচনায় প্রকাশ করেছেন ঃ

> তোমরা পরস্পরকে ভাইয়ের মতো ভালোবাস। অন্যকে নিজের চেয়ে শ্রেয় মনে করে সম্মান কর (রোমীয় ১২ : ১০)।

৭. *ত্বরিত বাধ্যতা*

কিন্তু এ-ই সবকিছু নয়। ঈশ্বর চান, তাঁর ইচ্ছা গ্রহণ করে ও তার বাধ্য হয়ে আমরা যেন নিজেদের ভগ্ন করি। গীতিকার সংক্ষেপে বলেছেন ঃ

> নির্বোধ অশ্ব বা অশ্বতরের মতো হোয়ো না তোমরা। বল্গা ও লাগাম দিয়ে ওদের বশে রাখতে হয়, তা না হলে ওরা তোমার বাধ্য হবে না (গীতসংহিতা ৩২ : ৯)।

তেজি ঘোড়া উৎসাহে টগবগ করে ফোটে; অশ্ব-শাবক একগুঁয়ে ও অবাধ্যতার প্রতীক। ঈশ্বরের ইচ্ছার ক্ষেত্রে আমাদের দু'ধরনের বিপদের সম্ভাবনা আছে। সুস্পষ্ট নির্দেশ না-পেয়েই, অথবা প্রেরিত না-হয়েই আমরা ঈশ্বরের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। আবার, প্রভুর সুস্পষ্ট নির্দেশকে স্বেচ্ছায় প্রতিরোধ করার সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে।

যোনা এর উদাহরণ। ঈশ্বর তাঁকে নিয়ে কী করতে চেয়েছিলেন—তা নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। ঈশ্বর তাঁকে আহ্বান করেছিলেন, নীনবীর লোকদের কাছে অনুতাপ প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তখনও ভগ্নচূর্ণ হননি। তাই তিনি এক বিপরীতগামী জাহাজে উঠে পড়লেন। তিমি মাছের পেটে দুঃস্বপ্নের রাত্রিগুলি অতিবাহনের পর তিনি ঈশ্বরের বাধ্য হলেন। এর পর, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা যে ভালো, নিখুঁত ও গ্রহণযোগ্য (রোমীয় ১২ : ২), তা প্রমাণ করার কাজে সক্রিয় হয়ে উঠলেন।

যীশু যে-গর্দভশাবকের উপর আরোহণ করে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন, তার মধ্যে ভগ্নতার এক বিস্ময়কর চিত্র দেখতে পাই (লুক ১৯ : ২৯-৩৫)। সেই সময় পর্যন্ত কোনো মানুষ তার উপর আরোহণ করেনি। কোনো মানুষ তার উপর আরোহণ করতে গেলে সে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেবে, এটাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু পরিত্রাতা যখন

এগিয়ে এলেন, প্রাণীটি ভগ্নতার এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ করল। গর্দভ-শাবকের ইচ্ছা তার স্রষ্টার ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণভাবে বশ্যতা স্বীকার করল।

ভগ্নতার উদাহরণ রূপে কুমোরের হাতে মাটির রূপালঙ্কারটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই বর্ণনা যথাযথ। প্রভুর স্পর্শে ভগ্নচিত্ত মানুষ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী গড়ে ওঠে।

তাই নতনম্র ঈশ্বর-ভক্তের প্রতিদিনের প্রার্থনা হবে ঃ

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর, পূর্ণ কর হে প্রভু,
তুমিই যে মূর্তিকার, আমি তো মৃত্তিকা মাত্র,
আমায় গড়ে তোল তোমারই ইচ্ছায়
যখন আমি সমর্পিত, প্রতীক্ষমান ও শান্ত।

তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ কর, পূর্ণ কর হে প্রভু,
আমায় কর অনুসন্ধান, তোমার কাজ হোক শুরু,
এখন ধৌত কর আমায়, কর প্রভু তুষারশুভ্র,
যেন তোমারই সম্মুখে হই আমি নতজানু।

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ কর, পূর্ণ কর হে প্রভু,
আমি শ্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত, সাহায্য কর আমায়।
অপার শক্তি ও ক্ষমতা, সবই তো তোমার,
হে মহান পরিত্রাতা, স্পর্শ কর, কর মোরে নিরাময়।

তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ কর, পূর্ণ কর হে প্রভু,
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হতে আমায় কর নিরস্ত,
তোমারই আত্মায় পূর্ণ কর, দেখুক জগৎ
খ্রীস্টই আমার মাঝে আছেন চির-বিরাজিত।

৮. *সাধারণ জনমত সম্পর্কে মৃত*

ভগ্নতার আরো অনেকগুলি দিক আছে। উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের এমন মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা দরকার যেখানে জগতের প্রশংসা বা বিরাগ কোনোভাবেই আমাদের চিত্তবিক্ষেপ ঘটাবে না। ডব্লিউ পি নিকলসন পরিত্রাণ লাভের পর স্যালভেশন আর্মির এক অফিসার তাঁর অভিভাবক হন। একদিন অফিসার তাঁকে বললেন, ‘‘তুমি যদি ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও, এই সাইনবোর্ডটা নিয়ে শহরের মাঝখানে কয়েক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাক।’’ বোর্ডটিতে লেখা ছিল ঃ **‘‘সাধারণ জনমত সম্পর্কে মৃত**।’’ খ্রীস্টের

পক্ষে নির্ভীকভাবে কাজ করার জন্য এই ঘটনাটি নিকলসনের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

৯. *অপরের পাপকে নিজের বলে স্বীকার করা*

আমাদের এমনই ভগ্নচূর্ণ হওয়া দরকার যে, ঈশ্বরের সন্তানদের পাপকে নিজেদের পাপ বলে গণ্য করুন। দানিয়েল তা-ই করেছিলেন (দানিয়েল ৯ : ৩-১৯)। তিনি যে সমস্ত পাপকে তালিকাবদ্ধ করেছেন, তার অধিকাংশের জন্য তিনি দোষী নন। কিন্তু ইস্রায়েল জাতির সঙ্গে তিনি এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন যে, তাদের পাপ হয়েছিল তাঁর পাপ। এই প্রসঙ্গে তিনি আর একজনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যিনি "আমাদের পাপ, আমাদের ব্যথা-বেদনা গ্রহণ করে সেগুলিকে নিজের করে তুলেছিলেন।" এখানে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, অনান্য বিশ্বাসীর সমালোচনা না-করে, বা তাদের দিকে অভিযোগের আঙুল না তুলে তাদের পাপকে নিজেদের পাপ বলে স্বীকার করা উচিত।

১০. *সংকটকালে শান্তভাব বজায় রাখা*

ভগ্নতার শেষ দিকটি হল, জীবনের সংকটকালে আমাদের মানসিক ভারসাম্য ও ধীরতা বজায় রাখতে হবে। যখন কোনো অনিবার্য বিলম্ব ঘটে, এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমরা বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ি। আমাদের নিয়মিত কাজকর্ম বিঘ্নিত হয়, আমরা বিরক্তি বোধ করি। কোনো যান্ত্রিক গণ্ডগোল বা দুর্ঘটনা কত সহজেই আমাদের হতাশাগ্রস্ত করে। কখনো কখনো আমরা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠি। সাময়িক উন্মাদনা, ক্রোধ, হিস্টিরিয়া আমাদের খ্রীস্টীয় সাক্ষ্যকে ধ্বংস করে দেয়।

ভগ্নচূর্ণ হবার পথে চলতে গেলে সংকটকালে আমাদের মেজাজ শান্ত রাখতে হবে, জানতে হবে, ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমস্ত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। ছোটোখাটো ত্রুটি হয়তো আপনার জীবনে বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা না-ঘটিয়ে আশীর্বাদ বয়ে আনতে পারে। যে-অপ্রত্যাশিত দর্শনার্থী প্রভুর পক্ষে আপনার কার্যক্ষেত্রে বিঘ্নের সৃষ্টি করেছেন, তিনি হয়তো আপনার এখনকার কাজের চেয়ে আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনাকে নিযুক্ত করতে পারেন। দুর্ঘটনা এবং তার অনুষঙ্গী জ্বালা-যন্ত্রণা, অসুবিধা এবং আর্থিক দায়—হয়তো আপনাকে এমন লোকের সংস্পর্শ নিয়ে আসবে, যে পবিত্র আত্মার সাহায্যে সুসমাচার গ্রহণ করার জন্য ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে আছে।

এই সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রভু আমাদের দেখতে চান, অধৈর্য না-হয়ে আমরা তৎক্ষণাৎ শান্তভাব বজায় রাখছি, বিদ্রোহী না-হয়ে ভগ্নচূর্ণ হচ্ছি।

ভগ্নতা বলতে কী বোঝায়, এখানে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। এই

তালিকা শ্রান্তিদায়ক নয়, পরামর্শদায়ক। প্রভুর সান্নিধ্যে পথ চলার সময় তিনি আমাদের ব্যক্তি-জীবনের ক্ষেত্রগুলিকে দেখিয়ে দেবেন, যেখানে ক্রুশের তলে আমাদের ভগ্নচূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। এবং এই ধরনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্র দেখিয়ে দেবার সময় তিনি আমাদের অনুগ্রহ দান করবেন।

> তোমাদের ইচ্ছা ও কর্ম যাতে তাঁর মনোমত হয়, তার জন্য ঈশ্বরই তোমাদের অন্তরে প্রেরণা জোগাচ্ছেন (ফিলিপীয় ২ : ১৩)।

ভগ্নতা কী নয়

ভগ্নতার কতকগুলি উপাদান লক্ষ করার পর, এই শব্দটির অর্থ কী নয়, সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। ভগ্নচিত্ত হবার জন্য কোনো মানুষ হবে মেরুদণ্ডহীন জেলিফিসের মতো হবে, এর অর্থ তা নয়। সেই মানুষ হবে শক্তিহীন, বা তার চারপাশের মানুষদের উপর তার কোনো প্রভাব থাকবে না, এর অর্থ তা-ও নয়। কিন্তু এর বিপরীত অর্থটিই সত্য। ভগ্নতা সবল চরিত্রের মানুষের সূক্ষ্মতম উপাদান। ভগ্নতা কোনো শৃঙ্খলা ভগ্ন করে না।

ভগ্নচিত্ত মানুষেরা সবচেয়ে প্রত্যয়ী চরিত্রের মানুষ। অন্য-জাগতিক দৃষ্টান্তের অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে তারা নীরবে প্রভাব বিস্তার করে। "তোমার অমায়িকতা আমাকে করেছে মহান" (গীতসংহিতা ১৮ : ৩৫) —এই শব্দগুচ্ছ স্ববিরোধী হলেও আপাতবিরোধী নয়। প্রয়োজন হলে নম্রচিত্ত মানুষের মনে ক্রোধের সঞ্চার হতে পারে। আমাদের প্রভু যীশুর জীবনে আমরা সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি চাবুকের আঘাতে মন্দির থেকে পোদ্দারদের বিতাড়িত করেছিলেন। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয়, তাঁর প্রতি কোনো অন্যায় আচরণ করা হয়েছিল বলে তিনি ক্রুদ্ধ হননি, তাঁর পিতার আবাস অনাদৃত হওয়ার কারণে তাঁর মনে ক্রোধের উদ্রেক হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ঈশ্বরের কারণে তিনি সিংহ, কিন্তু নিজের কারণে তিনি ছিলেন মেষশিশু।" বহু শহিদ ও সংস্কারক ভগ্নচিত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন দুর্বল, সমাজে তাঁদের কোনো প্রভাব ছিল না, এ কথা উচ্চারণ করার মতো মানুষ দুর্লভ।

প্রজন্মের ব্যবধান

সন্তান এবং পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে নম্রতার অনুশীলন করা খুবই কষ্টকর। পতিত মানব প্রকৃতির কারণে অনেক সময়েই আমরা ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের সঙ্গে সপ্রেম ব্যবহার করি না। বহু খ্রীশ্চান কিশোরীর মনে সর্বদা লড়াই হয়ে চলেছে, কারণ তাদের

মায়ের বিরুদ্ধে তারা বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। বহু খ্রীশ্চান, বিশেষত তাদের বাবার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে না। দুই প্রজন্মের মধ্যে ব্যবধানের কথা কেউ অস্বীকার করে না। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যবধান সীমাহীন। যুবকরা অভিযোগ করে, তাদের পিতামাতারা তাদের বোঝেন না, তাদের উপর তাঁরা দমন নীতি চালান এবং বহু সময়েই তারা পিতামাতার সংস্পর্শ পায় না। কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও, বহু যুবক-যুবতী অপরাধ ও লজ্জাবোধ করে এই জন্য যে, তারা এই মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে ও খ্রীস্টবিশ্বাসীর মতো আচরণ করতে পারে না। তারা উপলব্ধি করে, তাদের সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে তাদের এত সুসম্পর্ক, অথচ বাড়িতে তারা এত শীতল ও বিবাদমুখর। তারা নিজেদের ঘৃণা করে, কারণ তারা প্রায়ই পিতামাতার মৃত্যুকামনা করেছে, কিন্তু নিজেদের ভগ্নচূর্ণ করা ও স্বীকার করা খুবই কষ্টকর।

ঈশ্বর যখন ইস্রায়েল জাতিকে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তিনি এই বিশেষ মানবিক সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন ঃ

> "তোমার পিতা ও মাতাকে সমাদর করিও, যেন তোমার ঈশ্বর প্রভু যে দেশ দিবেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়" (আদি পুস্তক ২০ : ১২)।

এই আজ্ঞাটি পৌল নতুন নিয়মে পুনরাবৃত্ত করেছেন ঃ

> "সন্তানেরা, তোমরা পিতামাতার বাধ্য হও, কারণ তা করাই সঙ্গত এবং খ্রীস্টানদের কর্তব্য। "তুমি পিতা ও মাতাকে সম্মান কর—" এটিই প্রথম অনুশাসন যার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি যুক্ত হয়েছে ঃ "তা হলে তোমার সফল হবে এবং পৃথিবীতে তুমি লাভ করবে দীর্ঘজীবন।" (ইফিসীয় ৬ : ১-৩)

পিতামাতাকে সম্মান করার ও তাঁদের বাধ্য হওয়ার অর্থ, শুধু তাঁদের আদেশ পালন করা নয়, তাঁদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা এবং প্রয়োজন মতো তত্ত্বাবধান করা। পৌল এর চারটি কারণ দেখিয়েছেন :

☐ এ যথার্থ ☐ যুবকদের মঙ্গলের জন্য ☐ শাস্ত্রসম্মত ☐ পূর্ণাঙ্গ জীবনে উন্নীত হওয়ার জন্য।

বহু যুবক-যুবতী বিশ্বাস করে থাকে, অন্যান্য ক্ষেত্র সম্ভব হলেও, তাদের ক্ষেত্রে এ সম্ভব নয়। *তাদের* পিতামাতারা কর্তৃত্বপ্রিয়।

এরজন্য ভগ্নচূর্ণ মানসিকতার প্রয়োজন। পিতা, মাতা বা উভয়ের কাছে গিয়ে বলতে হবে, "তোমাদের সঙ্গে এই রকম সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আমি দুঃখিত। তোমরা আমার জন্য যা করেছ, সেজন্য আমি কখনো ধন্যবাদ দিইনি, কিন্তু এখন আমি সেই কাজটা শেষ করতে চাই। আমাদের মাঝখানে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলার

জন্য, আমি তোমাদের ক্ষমা চাই। আমি চাই, ঈশ্বরের সহায়তায় ভবিষ্যতের সবকিছু নতুন হয়ে উঠুক।''

অপব্যয়ী পুত্রের কাহিনীটি প্রজন্মের ব্যবধানের মধ্যে সেতুবন্ধনের চিরনতুন এক দৃষ্টান্ত। অপব্যয়ী পুত্রটি তার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না। সে তার উত্তরাধিকার তখনই পেতে চাইল। সে সম্পত্তি পেল, এবং তা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। এর পর সে আমোদ-প্রমোদ, খানাপিনা, যৌন ব্যভিচার প্রভৃতিতে মেতে রইল। শেষে তার সব অর্থ ফুরিয়ে গেল, বন্ধুরাও সরে পড়ল। তার বেঁচে থাকাই দুর্বিসহ হয়ে উঠল। সে তার বাড়ির পরিচারকদের কথা চিন্তা করতে লাগল—তারা তার চেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে। সে কত বোকামিই করেছে! সে পূর্ণহাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, এখন রিক্তহাতে ফিরে যাচ্ছে! সে সুবিচার দাবি করেছিল, এখন দয়ার ভিখারি। সে মাথা উঁচু করে গৃহত্যাগ করেছিল, এখন নতমস্তকে ফিরে যাচ্ছে!

সে বলল, ''বাবা, আমি ঈশ্বরের এবং তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। তোমার পুত্র হবার যোগ্যতা আমার নেই....।'' সে আরো অনেক কথা বলতে চেয়েছিল। সে পিতার কাছে পরিচারকের চাকরির জন্য মিনতি করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই পিতা তাঁর পরিজনদের কাছে এক আদেশ জারি করে দিয়েছেন। এবং অনতিবিলম্বে পুত্রকে নতুন পোশাক করানো হল, তার আঙুলে পরিয়ে দেওয়া হল একটা সুন্দর আংটি। পায়ে দেওয়া হল নতুন জুতো। তাকে নিয়ে উৎসব-আনন্দ ও ভোজ শুরু হল। চিত্তের ভগ্নতার দ্বারা ব্যবধানের মধ্যে সেতু-বন্ধন করা হল। কিন্তু পুত্র যদি ভগ্নহৃদয়ে, অনুতপ্ত হয়ে তার পাপ স্বীকার না-করত, তবে সে পিতার প্রেম-চুম্বনের আস্বাদ কোনোদিনই পেতে পারত না।

অবনত হৃদয়ে এই ধরনের ক্ষমাভিক্ষা ছাড়া আর কোনো কিছুই বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতাকে দূর করতে পারে না। পরবর্তীকালে সে যদি পিতার প্রতি অপ্রেম দেখাতে প্ররোচিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে, ভগ্ন হবার দগ্ধকর লজ্জার কথা এবং এ তার মানসিকতা দমন করতে সাহায্য করবে।

বিবাহ সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধান

সম্ভবত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে দ্বিতীয় সবচেয়ে কষ্টকর চিত্ত-ভগ্নতার প্রয়োজন দেখা দেয়। আবার বলছি, এই ঘটনা যারা আমাদের ঘনিষ্ঠতম তাদের সঙ্গে হৃদয়হীন আচরণের ও যাদের প্রায় চিনিই নয়, এমন লোকদের সঙ্গে সুন্দর ও সৌজন্যমূলক আচরণের প্রমাণ দেয়। প্রায়ই আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, নিজের ঘরে আমরা শয়তান, কিন্তু বাইরের লোকের কাছে সজ্জন ব্যক্তি।

বিবাহ-সম্পর্কের মধ্যে যে চাপ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, বাইবেলে তা বাস্তব

সম্মতভাবে অনুমান করা হয়েছে। আমরা বিশেষভাবে কলসীয় ৩ : ১৯ পদটি চিন্তা করে দেখি ঃ

> স্বামীরা, তোমরা নিজেদের পত্নীকে ভালোবাস, তাদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ কোরো না।

স্বামীর মনে এমনভাবে তিক্ততা বাসা বাঁধতে পারে যে, তিনি এর ঊর্ধ্বে ওঠার কোনো চেষ্টাই করেন না। তিনি সমস্ত আশা-ভরসা পরিত্যাগ করেন, এবং স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে এর সমাধান খোঁজেন।

অমল ও পরমার ঘটনাটি স্মরণ করুন। তাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় তারা ভেবেছিল, তারা একে অপরের জন্য। পরবর্তী কয়েক মাস তারা সাক্ষাতের প্রত্যেকটি সুযোগকে কাজে লাগানো। ছ'মাসের মাথায় তারা বাগদান করল এবং ছ'মাস পরে তাদের বিবাহের দিন স্থির হল। কিন্তু ঘটনার প্রবাহে তারা বাগদানের চার মাস পরে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হল।

বিবাহের উৎসব শেষ হয়ে গেল। প্রথম বছরটা খুব সুন্দরভাবে মসৃণ গতিতে অতিবাহিত হল। তখন একদিন তাদের মধ্যে প্রচণ্ড কলহ হল। পরমা বিবাহ-পূর্ব ঘটনা নিয়ে তার হৃদয়ে অমলের প্রতি যে-অশ্রদ্ধা দমন করে রেখেছিল, তা পুরোপুরি উগরে দিল। অমলও একই পথ ধরল। সে উপলব্ধি করল, পরমার প্রতি তার ভালোবাসার চেয়ে তিক্ততা আরও বেশি (২ শমূয়েল ১৩ : ১৫)।

বন্ধুদের পরামর্শে তারা এক খ্রীশ্চান বিবাহ উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা ছিল দুর্গের প্রাচীরের মতোই কঠিন ও অনমনীয়।

শেষ অমল বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করল। কিন্তু আদালতে শুনানি শুরু হবার পূর্বেই এক খ্রীশ্চান-বন্ধু তাকে ভগ্নতার পথে চেষ্টা করতে বলল। বন্ধুটির স্ত্রীও সেই একই সময়ে পরমার কাছে এল একই আবেদন নিয়ে, প্রভুর এবং পরস্পরের কাছে তোমরা ভগ্নচিত্ত, অবনত হচ্ছ না কেন? নতুন করে জীবন শুরু করার জন্য অতীতকে কেন খ্রীস্টের রক্তে আবৃত করছ না?

তারা সেই কাজই করল। এটা কঠিনতম কাজ। কিন্তু তারা এক সঙ্গে মিলিত হয়ে সবকিছু স্বীকার করল। তার মধ্যে কোনো লুকোচুরি বা প্রতিহিংসার মনোভাব ছিল না। এ ছিল সুস্পষ্ট স্বীকৃতি। তাদের বিবাহ-পূর্ব পাপের জন্য তাদের দু'জনেরই ভূমিকা তারা স্বীকার করল। চোখের জলে প্রভুর কাছে সবকিছু স্বীকার করার পর, তারা সিদ্ধান্ত নিল, এই পাপের জন্য তারা আর কখনোই পরস্পরকে দোষারোপ করবে না। ১ যোহন ১ : ৯ পদ অনুযায়ী তারা ঈশ্বরের ক্ষমা দাবি করল। তারা সানন্দচিত্তে সর্ববিষয়ে পরস্পরকে ক্ষমা করল। তারা যখন নতজানু অবস্থা থেকে উঠল, এক সীমাহীন বোঝা

দুজনেরই অন্তর থেকে দূর হয়ে গেছে। তারা উপলব্ধি করল, তাদের মধ্যে তখনও কিছু কিছু বোঝাপড়ার অভাব রয়েছে, কিন্তু তিক্ততা ও শত্রুতার ক্ষীণ আভাসটুকু অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারা বুঝতে পারল, ভবিষ্যতে সংসারে সমস্যা দেখা দিলে তাদের নতজানু ও ভগ্নচিত্ত হতে হবে।

কয়েক মাস পরে অমল একটা সান্ধ্য কাগজে লিখল, মানুষ বিবাহ পরামর্শদাতার কাছে গিয়ে কত সময় ও অর্থব্যয় করে এবং বহু ধরনের ব্যয়বহুল চিকিৎসা করে, কিন্তু তারা ভগ্নতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে না। চিত্তের ভগ্নতা ব্যতীত অন্য সব বিষয় মূলত অকার্যকর।

ঈশ্বর চান, আমরা সকলেই হব ভগ্নচিত্ত

শুধু সন্তান-পিতামাতার সম্পর্কে, বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নয়, প্রভু চান, আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেন আমরা ভগ্নচিত্ত হই। তিনি যাকোবের সঙ্গে যেমন যুদ্ধ করেছিলেন, আমাদেরও সঙ্গে তেমনই যুদ্ধ করতে চান। তিনি আমাদের গর্ব, নিজস্ব ইচ্ছার ক্ষমাহীন মনোভাব, অনমনীয় মানসিকতা, গালগল্প, পরের ছিদ্রান্বেষণ, জাগতিকতা, অপবিত্রতা, মেজাজ, জৈব প্রকৃতির সর্বপ্রকার কাজের সঙ্গে সংগ্রাম করবেন। তিনি আমাদের যাকোব থেকে ইস্রায়েলে, প্রতারক থেকে রাজকুমারে, শক্তিহীন থেকে শক্তিমান মানুষে পরিণত করতে চান। তিনি প্রভাত পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, আমাদের উরুফলক সন্ধিচ্যুত করবেন। এর পর আমাদের ভগ্নজীবনের বাকি দিনগুলিতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন ও আমাদের ব্যবহার করবেন।

ঈশ্বর চান, আমরা যেন নিষ্কলঙ্ক হই। আমরা কেউই নিষ্পাপ নই, কিন্তু আমরা সকলেই নিষ্কলঙ্ক হতে পারি। যে-মানুষ অন্যায় কর্ম করে সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়পথে ফিরে আসে, সেই ব্যক্তিই নিষ্কলঙ্ক। সে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তার ক্রোধ পোষণ করে রাখে না। স্বীকারোক্তি ও ক্ষমা ভিক্ষার মাধ্যমে সে ঈশ্বরের এবং সহ-মানবের সঙ্গে সংযোগপথ সঠিক রাখে। স্থানীয় মণ্ডলীর প্রধানকে অবশ্যই নিষ্কলঙ্ক হতে হবে (১ তীমথি ৩ : ২), এবং সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসীও তা পারে।

ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা করুন

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, আমাদের পরিবারে, আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীতে এবং ব্যবসায় জগতে— আমরা সকলেই যদি ভগ্নচিত্ত হই, তা হলে তার কী অর্থ হবে, একবার চিন্তা করে দেখুন।

ভগ্নতা আমাদের জীবনে নিয়ে আসবে আরো শক্তি, আরো সুখ এবং সুস্বাস্থ্য। যারা খ্রীস্টের নম্রতা ও মৃদুতায় পথ চলে, তারা অন্যদের জীবনের আত্মিক প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর সেবার মধ্য দিয়ে তারা পরিপূর্ণতা এবং বিশ্রাম খুঁজে পায়। এবং আমাদের অধ্যাত্মজীবনে যা মঙ্গলজনক, আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও তা মঙ্গলকর।

ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে একবার একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, ''মানবদেহে এমন কোনো তন্তু নেই যা আত্মা থেকে পুরোপুরি দূর করা যেতে পারে।'' ডা. পল টারনিয়ের তাঁর এক রোগিনীর কথা বলেছিলেন, যে কয়েক মাস ধরে রক্তাল্পতায় ভুগছিল। হঠাৎ অলৌকিকভাবে তার রক্তাল্পতা অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তার রক্তের পরিমাণ নিয়মিত হল। এর কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেল, তার জীবনে একটা আত্মিক সংকট চলছিল, ধরা যাক, সে দীর্ঘদিনের প্রতিহিংসার মনোভাব দূর করে ক্ষমা করতে পেরেছে। তার চিত্তের এই ভগ্নতা তার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়েছিল।

কোনো এক পরিবারের কথা চিন্তা করুন, যার সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। কখনো কখনো মত পার্থক্য অবশ্যই দেখা যেত, কিন্তু সেই মতপার্থক্য তারা মতবিরোধে পরিণত করত না। পরিবারটি নিজেদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। যীশু এই ধরনের পরিবারেই বাস করতে ভালোবাসেন।

স্থানীয় মণ্ডলীতে ভগ্নতাই উদ্দীপনার পথ। আত্মিক ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী নীতি আছে—চিত্তের ভগ্নতা আশীর্বাদের উৎসস্থল। নতুন গৃহ, নতুন পদ্ধতি—সব কিছুই আমরা নতুন করে চেষ্টা করি, কিন্তু ঈশ্বর অনুতাপ ও হৃতমানতার অপেক্ষা করে আছেন। আমাদের অনুতাপের মধ্য দিয়ে আশীর্বাদের প্রবাহ বয়ে আসে।

> আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব (২ বংশবলি ৭ : ১৪)।

নম্রতার মাধ্যমে ব্যবসায় জগতে খ্রীস্টবিশ্বাসীরা কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, চিন্তা করে দেখুন। জাগতিক মানুষেরা ভগ্নচিত্ত নয়। সমগোত্রীয় মানুষদের কাছে তারা শক্তির দম্ভ দেখাতে চায়। কিন্তু তারা যখন এমন মানুষের সাক্ষাতে আসে, যে ক্রুদ্ধ হয় না, তার অন্যায় স্বীকার করে এবং তা এজন্য ক্ষমা চায়, যে প্রভু যীশুর অনুগ্রহ প্রদর্শন করে—তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। আজকের রূঢ় এবং বিশৃঙ্খল বৈষয়িক জগতে এ এক অতিলৌকিক জীবন, যা যীশুর পক্ষে উচ্চকণ্ঠে সাক্ষ্য দেয়।

প্রভু, চূর্ণ কর আমায়

কয়েক বছর আগে এক প্রার্থনা সভায় আমি এক তরুণ-বিশ্বাসীকে আকুল প্রার্থনা করতে শুনেছিলাম, ‘‘প্রভু, আমাকে ভগ্নচূর্ণ কর!’’ তার এই প্রার্থনা আমাকে আঘাত করেছিল। আমার জীবনের এত বছরেও আমি কখনো এই প্রার্থনা করিনি। এমন-কী সেই সময়েও আমি এসব প্রার্থনা করতেও প্রস্তুত ছিলাম কি না, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত নই। কিন্তু এই তরুণ-বিশ্বাসীর হৃদয় থেকে উৎসারিত উক্ত শব্দসমষ্টি আমাকে সচেতন করিয়ে দিল যে, আমার নিজের জীবনেও ভগ্নতার অতিশয় প্রয়োজন আছে। সেগুলি আমার মধ্যে এক চেতনার সৃষ্টি করল যে, আধ্যাত্মিক জগতে ভগ্নতা এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। সেগুলি এখন এক আকুল হৃদয়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা হয়ে উঠেছে ঃ

প্রভু, চূর্ণ কর আমায়!